অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

ছায়াময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

২. আঙুল দিয়ে বাতাসে আঁকিবুকি 14
৩. নিজের নাম নিয়ে একটু দুঃখ 33
৪. গগন সাঁপুইয়ের বাড়ির পেছন দিকে 51
৫. অঙ্কের সার রাসমোহনবাবু 65
৬. রাত্রিবেলাটাই ভয়ের সময় 83
৭. চণ্ডীমণ্ডপে আজ বেজায় গণ্ডগোল 92

১. পেশকার গগন সাঁপুইয়ের বাড়িতে

পেশকার গগন সাঁপুইয়ের বাড়িতে মাঝরাতে এক চোর ধরা পড়ল। চোরকে চোর, তার ওপর আবার আহাম্মকও। পালানোর অনেক পথ ছিল। সাঁপুইবাড়ি হচ্ছে শিমুলগড় গাঁয়ের পুবপ্রান্তে, তারপরই দিক-দিগন্ত খোলা। মাঠ-ময়দান-জঙ্গল-জলা। কে খুঁজতে যেত সেখানে! তা না করে আহাম্মকটা গগন সাঁইয়ের লাকড়ির ঘরে সেঁদিয়ে বসে ছিল।

এক হিসাবে চোরটাকে ভালই বলতে হবে। গুলিবন্দুক, ছোরা-ছুরি বা লাঠি-সোটা বের করেনি, সেসব ছিলও না তার কাছে। দুরবস্থায় পড়েছে–তাই দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে একটা নীল ছেঁড়া হাফশার্ট, আর পরনে একখানা তালিমারা পাতলুন। পায়ে ফুটোফাটা একজোড়া কেস জুতো। দুহাতে একখানা চামড়ার থলি জাপটে ধরে বসে ছিল।

গগনের বন্দুক আছে, গোটা কয়েক পাইক আছে, তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে আছে, দুটো বাঘা দিশি সড়ালে কুকুর আছে। আহাম্মক

হলে সাঁপুইবাড়িতে চোর ঢোকে কখনও? মাঝরাতে চেঁচামেচি শুনে গাঁয়ের লোক জড়ো হল। তবে বাইরের লোকের সাহায্য দরকার হল না। গগনের পাইকরাই লাকড়ির ঘর থেকে চোরটাকে টেনে বের করল।

গাঁয়ের মাতব্বরদের দেখে গগন আপ্যায়ন করে বলল, "আসুন, আসুন, আপনারা। দেশের অরাজকতাটা একবার স্বচক্ষে দেখে যান। এই সুভাষ বোস, গান্ধীজি, সি. আর. দাশ, মাইকেল, মাতঙ্গিনী হাজরা, রবি ঠাকুরের দেশের কী হাল হয়েছে দেখুন। আইন শৃঙ্খলার কী নিদারুণ অবনতি; এ যে দিনে ডাকাতি! এ যে পুকুরচুরি! তবে যাঁ, ধর্মের কল আজও বাতাসে নড়ে। যেমন কর্ম তেমন ফল–মহাকবির এই বাণী আজও মিথ্যে হয়ে যায়নি। বাতাসে কান পাতলে আজও শুনতে পাবেন ভগবানের দৈববাণী, "সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!"

পটল গাঙ্গুলি বিচক্ষণ মানুষ, গঞ্জের সবাই খুব মানে। উঠোনের ওপর গগনের এগিয়ে দেওয়া কাঠের চেয়ারে জুত করে বসে হ্যাঁজাকের আলোয় চোরটাকে ভাল করে দেখলেন। নিতান্তই অল্প বয়স। কুড়ি বাইশের বেশি হবে না। চেহারাটা একসময়ে হয়তো মন্দ ছিল না, কিন্তু অভাবে-কষ্টে একেবারে চিমসে মেরে গেছে। গাল বসা, চোখের কোলে কালি। পটল বললেন, "ও গগন, তা চোরে তোমার নিল কী?"

"সেসব তো এখনও হিসাব কষে মিলিয়ে দেখা হয়নি। তবে একটা থলি দেখতে পাচ্ছি।"

"থলিতে কী আছে?"

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কী আর থাকবে। গরিবের যথাসর্বস্ব। যা কিছু তিল তিল করে জমিয়ে তুলেছিলাম, বুকের বিন্দু-বিন্দু রক্ত জল করে আমার দুধের বাছাদের জন্য যে খুদকুঁড়োর ব্যবস্থা রেখে যেতে চেয়েছিলাম, তার সবটুকুই তো ওই থলিতে। হকের ধন মেসো, ধর্মের রোজগার, তাই ব্যাটা পালাতে পারেনি।"

নটবর ঘোষ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থলিটা রেখেছিলে কোথায়?"

গগন মাথা নেড়ে বলল, "থলি আমার নয়। দামি চামড়ার জিনিস। মনে হচ্ছে, ছোঁড়া থলিটা কোনও বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে।"

হেডসার বিজয় মল্লিক বললেন, "কী-কী চুরি গেছে তা কি হিসাব করে দেখেছ?"

গগন মাথা নেড়ে বলে, "দেখার সময় পেলুম কই! যা-কিছু সরিয়েছে তা ওই থলির মধ্যেই আছে মনে হয়। তবে সঙ্গে কোনও শাগরেদ ছিল কি না বলতে পারি না। যদি তার হাত দিয়ে কিছু চালান করে দিয়ে থাকে তবে আলাদা কথা। সেসবও হিসাব করে খতিয়ে দেখতে হবে।"

গগনের লোকেরা আরও দুটো হ্যাঁজাক জ্বেলে নিয়ে এল। বিয়েবাড়ির মতো রোসনাই হল তাতে। সেই আলোয় দেখা গেল, চোর-ছেলেটা ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মুখে

বাক্য নেই। দুটো পাইক বাঘা হাতে তার দুটো কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে আছে। হুকুম পেলেই তারা ছোঁড়ার ওপর ডলাইমলাই, রদ্দা-কিল শুরু করতে পারে।

তার সুযোগও এসে গেল হঠাৎ। বলা নেই কওয়া নেই, রোগা চোরটা হঠাৎ হাঁচোড়পাঁচোড় করে পাইক দুটোর হাত ছাড়িয়ে ঝটকা মেরে পালানোর ক্ষীণ একটা চেষ্টা করল যেন। পারবে কেন? পাইক দুটোর বজ্রমুষ্টি ছাড়ানোর সাধ্যই তার ছিল না, আর ছাড়ালেও চারদিকে ত্রিশ-চল্লিশজন মানুষের বেড়া ভেদ করবেই বা সে কী করে? তার এই বেয়াদবিতে পাইক দুটো দুদিক থেকে তার কোমরে আর পিঠে এমন দুখানা হাঁটুর গুতো দিল যে, ছোঁকরা ককিয়ে উঠে যন্ত্রণায় বসে পড়ল মাটিতে। পাইক দুটো এত অল্পে খুশি নয়, তারা দুদিক থেকে পর-পর কখানা রদ্দা বসাল তার ঘাড়ে। ছোঁক একেবারেই নেতিয়ে পড়ল না এবার। চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

গগন সাঁপুই শশব্যস্তে বলল, "ওরে করিস কী? থাক, থাক, মারধোর করিসনি। চোর ধরা আমাদের কাজ বটে, কিন্তু তার বিচার আর শাসনের ভার আমাদের ওপর নেই রে বাবা। সেসব সরকারবাহাদুর বুঝবেন, আর বুঝবেন গাঁয়ের মোড়লরা। আমাদের কী দরকার পাপের বোঝা ভারী করে? গাঁয়ের মান্যগণ্য মানুষেরা এসেছেন, পরিস্থিতিটা তাঁদের বিচার করতে দে।"

বলতে বলতে গগন সাঁপুই সংজ্ঞাহীন ছেলেটির শিথিল হাতের বাঁধন থেকে অতি সাবধানে থলিটা তুলে নিল। বেশ ভারী থলি। গগনেরও বেশ কসরত করতে হল থলিখানা তুলে নিতে। থলির ভেতরে ধাতব জিনিসের ঝনৎকার শুনে নটবর ঘোষ কৌতূহলী হয়ে বলে উঠল, "দেখি-দেখি, কী আছে থলিতে।"

গগন জিভ কেটে মোলায়েম হেসে বলে, "ওই অনুরোধটি করবেন না নটবরখুড়ো। চারদিকে শত্রুর কুনজর। এত জোড়া চোখের সামনে আমি এ-জিনিস খুলে দেখাতে পারব না। কাল সকালের দিকে আসবেন, এক ফাঁকে দেখিয়ে দেব' খন। তেমন কিছু নয়, গরিবের বাড়িতে আর কীইবা থাকবে।"

বিজয় মল্লিক আমতা-আমতা করে বললেন, "তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল হে গগন। থলিতে অন্য বাড়ির চোরাই জিনিসও তো থাকতে পারে। তখন আবার তুমি ফেঁসে যাবে।"

"যে আজ্ঞে। এখনই দেখে বলছি ধর্মত ন্যায্যত আমারই জিনিস কি না। ওরে ভুতো টর্চটা একটু ধর তো থলির মুখটায়।"

ভুতো টর্চ ধরল। গগন সাঁপুই থলির মুখটা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরেই বলে উঠল, "নিয্যস আমারই জিনিস বটে মশাইরা। এসবই আমার বুকের রক্ত জল করে জোগাড় করা। ওরে, তোরা ছোঁড়াটার চোখে-মুখে জল দিয়ে লাকড়ির ঘরেই পুরে রাখ।"

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের ওদিক থেকে একটা বববববম' শব্দ উঠল। শব্দটা সকলেরই চেনা। এ হল গে কালী কাপালিক। তবে কি না পেঁয়ো যোগী, ভিখ পায় না, কালী কাপালিককেও এই গঞ্জ এলাকার কেউ বিশেষ মানে না। কালী একসময়ে ছিল কালীচরণ গোপ। বাজারের সত্যচরণের মুদির দোকানে কাজ করত। চুরি ধরা পড়ায় সত্যচরণ তাড়িয়ে দেয়, কালীর বাবা নরহরিও তাকে ত্যজ্যপুতুর করে। কালী না কি তারপর তন্ত্র শিখতে কামাখ্যা চলে যায়। কয়েক বছর হল ফিরেছে। পরনে রক্তাম্বর, মাথায় জটা, মুখে পেল্লায় দাড়ি-গোঁফ। বাড়িতে ঠাঁই হয়নি। এখন বটতলার পুরনো ইটভাটার কাছে আস্তানা গেড়ে আছে। শাগরেদও আছে কয়েকজন। কেউ পাত্তা না দিলেও কালী গঞ্জের সব ব্যাপারেই নাক গলায়। মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। সে শাপশাপান্ত করে, বাণ-টান মারে, তবে তাতে বিশেষ কারও ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

ভিড় ঠেলে পেল্লায় চেহারার কালী সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরে হাত দিয়ে ভূপতিত চোরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "হুঁ, সন্ধেবেলাতেই ছোঁড়াকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলুম, ওরে আজ অমাবস্যা, তায় তোর গ্রহবৈগুণ্য আছে, আজ বাড়ি যা। তা

শুনল না। নিয়তি কেন বাধ্যতে। চন্দ্র-সূর্য এদিক-ওদিক হয়, কিন্তু কালী কাপালিকের কথার নড়চড় হওয়ার জো নেই।”

পটল গাঙ্গুলি ভ্রূ কুঁচকে বলে, “চিনিস নাকি ওকে?”

কালী পটল গাঙ্গুলিকে একটু সমঝে চলে। অনেককাল আগে এই পটল গাঙ্গুলির একটা গোরু নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে দু’আনা পয়সা রোজগার করে শিবরাত্রির মেলায় শোনপাপড়ি খেয়েছিল। তার ফলে খুব খড়ম-পেটা হয়েছিল গাঙ্গুলির হাতে। আজও ব্যথাটা কপালের বাঁ ধারে চিনচিন করে। কালী গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, “চিনব কী করে! সন্ধেবেলা এসে আমার আস্তানায় ভিড়ে পড়েছিল। বলছিল, কোথাও যাওয়ার আছে যেন। একটু রাত করে বেরোবে। সন্ধেটা কাটিয়ে যেতে চায়। সঙ্গে ওই একখানা চামড়ার ব্যাগ ছিল।”

পটল গাঙ্গুলি বলে উঠল, “ওই ব্যাগটা কি, দ্যাখ তো।”

কালী গগনের হাতের ব্যাগখানা দেখে বলল, “ওইটেই, ভেতরে বেশ ভারী জিনিস আছে। ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল।”

গগন সাঁপুই অমায়িক হাসি হেসে বলল, “ভুল দেখেছ কালী। ব্যাগের মধ্যে তখন জিনিস-টিনিস ছিল না, তবে এখন হয়েছে। ওরে ভুতো, ব্যাগখানা তোর মায়ের হেফাজতে দিয়ে আয় তো!”

ভূতো এসে ব্যাগটা নিয়ে যেতেই বিজয় মল্লিক বলল, “গগন, পুলিশে একটা খবর পাঠানো ভাল।”

গগন মাথা নেড়ে বলে, “যে আজ্ঞে, সকালবেলাতেই ভল্টাকে পাঠিয়ে দেব’খন ফাঁড়িতে। ও নিয়ে ভাববেন না।”

কালী কাপালিক গগনের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে হঠাৎ ফিচিক করে একটু হেসে বলল, "গগনবাবু, তোমার লাল গোরুটা শুনেছি ভাল দুধ দিচ্ছে আজকাল। সকালের দিকে আমার রোজ আধসেরটাক দুধ লাগে। বুঝেছ?"

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, "দুধ! হঠাৎ এই মাঝরাতে চোরের গোলমালে দুধের কথা ওঠে কেন রে কালী?"

"ওঠাও বলেই ওঠে। কাল সকাল থেকেই বরাদ্দ রেখো। আমার এক চেলা ঘটি নিয়ে আসবে।"

গগন ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, "শোনো কথা! ওরে যা-যা, এখন বিদেয় হ। দুধের কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।"

কালী কাপালিক একটা হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বলল, "আরও কথা আছে হে গগনচন্দ্র সাঁপুই। ইটভাটার পাশে বটতলার আস্তানাটা অনেকদিন ধরে বাঁধিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে। ভগবান তো তোমায় মেলাই দিয়েছেন। কালী কাপালিকের জন্য এটুকু করলে আখেরে তোমার ভালই হবে। বুঝলে?"

এই চোর ধরার আসরে দুধ আর আস্তানা বাঁধানোর আবদার কালী কেন তুলছে তা কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে কালীর সাহসটা যে বড় বেড়েছে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আগে তো গঞ্জের পুরনো লোকেদের কারও মুখের ওপর এরকম বেয়াদবি গলায় কথা বলত না!

পটল গাঙ্গুলি বেশ চটে গিয়ে বললেন, "ওরে কালী, তোর হঠাৎ হলটা কী? এ যে আরশোলাও হঠাৎ পক্ষী হয়ে উঠল দেখছি!"

গগন সাঁপুই কাতর কণ্ঠে বলল, "দেখুন আপনারাই দেখুন, কী অবিচারটাই না আমার ওপর হচ্ছে। এত বড় একটা চুরির ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই আবার..."।

কালী আরও একটা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভিড়ের পেছন থেকে একটা বাজখাই গলা বন্দুকের মতো গর্জে উঠল, "অ্যাই বোকা, দূর হ এখান থেকে!"

গলাটা কালী কাপালিকের পঁচাশি বছর বয়সী বাবা হরনাথের। কালী আজও তার বাপকে যমের মতো ভয় পায়। এক ধমকেই সে সুড়সুড় করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে একটু চাপাস্বরে গগনকে বলে গেল, "আজ যাচ্ছি, কিন্তু কাল আবার দেখা হবে।"

চোর ধরার পর্ব একরকম শেষ হয়েছে। চোরটাকে পাইকরা আবার ধরাধরি করে লাকড়ির ঘরে তুলে নিয়ে গেল। একে-একে লোকেরা ফিরে যাচ্ছে। পটল গাঙ্গুলি আর বিজয় মল্লিকও উঠে পড়লেন।

নটবর ঘোষ যাওয়ার আগে বললেন, "তোমার বাড়িতে কী করে যে চোরটা ঢুকল সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। এ তো বাড়ি নয়, দুর্গ।"

কাঁচুমাচু মুখে গগন বলল, "নিত্যানন্দ ঘোষালের জমির ওই বেলগাছটাই যত নষ্টের গোড়া। দেখুন না, ওই তো দেখা যাচ্ছে। আগে এত বাড়বাড়ন্ত ছিল না গাছটার, এবার হয়েছে। গাছের ডাল বেয়ে এগিয়ে ওই খড়ের গাদায় ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল বোধহয়। আপনারা সবাই মিলে বলে কয়ে বুঝিয়ে গাছটা কাটিয়ে ফেলতে ঘোষালকে রাজি করান। আমি অনেক বলেছি, ঘোষাল কথাটা কানেই তোলে না।"

"বেলগাছ কাটতে নেই হে বাপু। তুমি বরং আরও একটু সজাগ থেকো। এক চোর যখন ঢুকেছে, আরও চোর এল বলে।"

লোকজন সব বিদেয় হয়ে যাওয়ার পর গগন সাঁপুই পাইকদের ডেকে বলল, "ওরে, আর দেরি নয়, ছোঁড়ার জ্ঞান ফেরার আগেই ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রথতলার মাঠে রেখে আয়। থানা-পুলিশের হাঙ্গামা কে করতে যাবে বাবা! জ্ঞান ফিরলে বাছাধন আপনিই চম্পট

দেবেখন। যা-যা, তাড়াতাড়ি কর। একটু চুপিচুপি কাজ সারিস বাবা, কেউ টের পেলে আবার পাঁচটা কথা উঠবে।”

লক্ষ্মণ পাইক একটু হতাশ হয়ে বলল, “ছেড়ে দেবেন! এই চোরটার পেট থেকে যে অনেক কথা টেনে বের করা যেত। চোরদের পেছনে দল থাকে। পুরো দলটাকেই ধরা যেত তা হলে?”

গগন ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে, “ওরে বাবা, চন্দ্র-সূর্য যতদিন আছে পৃথিবীতে চোর-ছ্যাঁচড়ও ততদিন থাকবে। কত আর ধরবি? আমি শান্তিপ্রিয় লোক, চোর ধরে আরও গোলমালে পড়তে চাই না। আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি। চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।”

লক্ষ্মণ পাইক বলবান লোক। একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “লোকলস্কর লাগবে না, বড়বাবু। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না। চোরটা একেবারেই হালকা-পলকা। আমি একাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসছি।”

“তাই যা বাবা, পাঁচটা টাকা বকশিশ পাবি।”

লক্ষ্মণ পাইক লাকড়ির ঘরে ঢুকে রোগা ছেলেটার সংজ্ঞাহীন দেহটি বাস্তবিকই ভাঁজ করা চাঁদরের মতো ডান কাঁধে ফেলে রওনা হল। রথতলার মাঠ বেশি দূরে নয়। রায়বাবুদের আমবাগান পেরোলেই বাঁশঝাড়। তারপরেই রথতলা। জোরকদমে হাঁটলে পাঁচ মিনিটের রাস্তাও নয়।

নিশুত রাত। চারদিক নিঃঝুম। লক্ষ্মণের বাঁ হাতে টর্চ। মাঝে-মাঝে আলো ফেলে সে অন্ধকার বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে রথতলায় পৌঁছে গেল। চারধারে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ছোঁড়াটাকে হড়াম করে ফেলে দিল ঘাসের ওপর।

ফিরে যাওয়ার আগে লক্ষ্মণ অন্ধকারে একটু দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা যদিও নীরেট এবং ভাবনা-চিন্তা তার মাথায় বিশেষ খেলে না, তবু এখন সে এই ছোঁকরার কথাটা একটু

ভাবছে। এই মাঠে পড়ে থাকলে একে সাপে কাটতে পারে, শেয়ালে কামড়াতে পারে, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। লক্ষ্মণ তার মনিবের হুকুম তামিল করেছে বটে, কিন্তু তার মনটা কেন যেন খুঁতখুঁত করছে।

একটু আনমনা ছিল লক্ষ্মণ, হঠাৎ ঘোর অন্ধকার থেকে একটা লম্বা হাত এগিয়ে এসে তার কাঁধে আলতোভাবে পড়ল।

"কে রে শয়তান?" বলে লক্ষ্মণ বিদ্বেগে ঘুরে তার বিশাল হতে একখানা মোক্ষম ঘুসি চালাল। ঘুসিটা কোথাও লাগল না। উলটে বরং ঘুসির তাল সামলাতে না পেরে লক্ষ্মণ নিজেই বেসামাল হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তখন দুখানা লোহার মতো হাত তাকে ধরে তুলল। কে যেন বলল, "ঘাবড়ে যেয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা করো। কথা আছে।"

কেমন যেন ফ্যাসফেসে গলা। সাপের শিসের মতো। শুনলে ভয়-ভয় করে। লক্ষ্মণ একটু ঘাবড়ে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

"সে-কথা পরে হবে।" লক্ষ্মণ টের পেয়েছে, লোকটার গায়ে বেজায় জোর। তার চেয়েও বেশি। সে সতর্ক গলায় বলল, "কথা কিসের? আমাকে এখনই ফিরতে হবে। দাঁড়ান, টর্চটা পড়ে গেছে, তুলি।"

"টর্চটা আমার পায়ের নীচে আছে। যাওয়ার সময় পাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথার জবাব দিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি বোধহয় এই চোরটার শাগরেদ!"

"হতেও পারে। এখন বলো তো, ওকে এখানে ফেলে যাওয়ার মানেটা কী?"

"গগনবাবু বললেন তাই ফেলে যাচ্ছি। তিনি পুলিশের হাঙ্গামা চান। তাঁর দয়ার শরীর, ছোঁকরাকে পালানোরও পথ করে দিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে চলে যাবে।"

লোকটা হাত-দুই তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে বেশ লম্বা চেহারা, এটা বোঝা যাচ্ছে। লোকটা ফ্যাসফেসে রক্ত- জল করা সেই গলায় বলল, "ও যে চোর তা ঠিক জানো?"

লক্ষ্মণ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "নিয্যস চোর। চোরাই জিনিস অবধি পাওয়া গেছে।"

"কী জিনিস?"

"তা আমি জানি না। গগনবাবু জানে।"

"রাত-পাহারায় কি তুমি ছিলে?"

"আমি আর শম্ভু।"

"চোর কীভাবে ঢুকল জানো?"

"বেলগাছের ডাল বেয়ে এসে খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামে। কুকুরগুলো তখনই চেঁচাতে শুরু করে। আমরাও লাঠি আর বল্লম নিয়ে দৌড়ে যাই।"

"গিয়ে কী দেখলে?"

"কিছু দেখিনি। তবে খড় ছিটিয়ে পড়ে ছিল। কুকুরগুলো লাকড়ির ঘরের দিকে দৌড়ে গেল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? বাড়ির সবাই উঠে পড়ল। চেঁচামেচি হতে লাগল। চোরও ধরা পড়ে গেল।"

"তা হলে চোরটা চুরি করল কখন?"

"তার মানে?"

"খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামতেই কুকুরগুলো চেঁচিয়ে ওঠে, তোমরাও তাড়া করে গেলে, বাড়ির লোকও উঠে পড়ল আর চোর গিয়ে ঢুকল লাকড়ির ঘরে। এই তো! তা হলে চুরি করার সময়টা সে পেল কখন? চুরি করতে হলে দরজা বা জানলা ভাঙতে হবে বা সিঁদ দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে, তারপর আবার সিন্দুক ভাঙাভাঙি আছে। তাই না?"

লক্ষ্মণ একটু জব্দ হয়ে গেল। তারপর বলল, "কথাটা ভেবে দেখিনি। চুরিটুরিও করিনি কখনও।"

"তুমি এ-গাঁয়ে নতুন, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই মোটে ছ'মাস হল:গগনবাবুর চাকরিতে ঢুকেছি।"

"গগন কেমন লোক তা জানো? "আজ্ঞে না। জানার দরকারই বা কী? যার নুন খাই তারই গুণ গাই।"

"খুব ভাল কথা। কিন্তু বিনা বিচারে ছেলেটাকে মারধোর করা কি ঠিক হয়েছে?"

লক্ষ্মণ মাথা চুলকে বলল, "ছোরা পালানোর চেষ্টা করছিল যে!"

"তোমার গায়ে বেশ জোর আছে। যেসব রদ্দা মারছিলে তাতে রোগা ছেলেটা মরেও যেতে পারত। মরে গেছে হয়তো।"

লক্ষ্মণ জিভ কেটে বলে, "আজ্ঞে না। মরেনি। খাস চলছে। বুকও ধুকধুক করছে।"

"ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। তবে আমার সঙ্গে যে তোমার কথা হয়েছে তা যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়।"

আমতা-আমতা করে লক্ষ্মণ বলে, "কিন্তু আপনি কে?"

"আমি এ-গাঁয়ের এক পুরনো ভূত। বহু বছর আগে মারা গেছি।"

লক্ষ্মণের মুখে প্রথমটায় বাক্য সরল না। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,"কী যে বলেন! জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি, মানুষ।"

"না, দেখতে পাচ্ছ না। যা-দেখছ তা ভুল দেখছ। এই যে টর্চটা নাও। সরে পড়ো।"

২. আঙুল দিয়ে বাতাসে আঁকিবুকি

আঙুল দিয়ে বাতাসে আঁকিবুকি কাটা আর বিড়বিড় করা রামবাবুর পুরনো স্বভাব। বাতাসে আঁকিবুকি করে কী লেখেন কেউ জানে না, অনেকে বলে, "আঁক কষেন। অনেকে বলে, ছবি আঁকেন। অনেকে বলে, "ভূতপ্রেতের সঙ্গে সঙ্কেতে কথা কন। দু-চারজন বলে, ওটা হচ্ছে ওর বায়ু। আসল কথাটা অবশ্য পুরনো দু-চারজন লোকেরই জানা আছে। রামপদ বিশ্বাস যৌবনে হাত-টাত দেখে বেড়াতেন। ভাল করে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন বলে কাশীতে গিয়ে এক মস্ত জ্যোতিষীর শাগরেদি করতে থাকেন। বেশ শিখে ফেলেছিলেন শাস্ত্রটা। হঠাৎ একদিন নিজের জন্মকুণ্ডলিটা গ্রাম থেকে আনিয়ে বিচার করতে বসলেন। আর তখনই চক্ষুস্থির। গ্রহ-সংস্থান যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ অতীব অন্ধকার। এ-কোষ্ঠীতে কিছুই হওয়ার নয়। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানাভাবে বিচার করলেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে ভরসা হওয়ার মতো কিছু নেই। হতাশ হয়ে তিনি হাল ছাড়লেন বটে, কিন্তু কোষ্ঠীর চিন্তা তাঁর মাথা থেকে গেল না। দিনরাত ভাবতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে কাগজে, তারপর দেওয়ালে বা মেঝেতেও নিজের ছকটা একে একমনে চেয়ে থাকতেন। বিড়বিড় করে বলতেন, "নাঃ, রবি অত নীচস্থ-ইস, শনিটাও যদি এক ঘর তফাত হত..মঙ্গলটার তো খুবই খারাপ অবস্থা দেখছি...!" সেই থেকে রামবাবুর মাথাটা একটু কেমন-ধারা হয়ে গেল। যখন হাতের কাছে কাগজ-কলম বা দেওয়াল-টেওয়াল জোটে না তখন তিনি বাতাসেই নিজের কোষ্ঠীর ছক আঁকতে থাকেন আর বিড়বিড় করেন। তবে নিজের কোষ্ঠীর ফলটা খুব মিলে গেছে তাঁর। কিছুই হয়নি রামবাবুর, ঘুরে-ঘুরে বেড়ান আর বিড়বিড় করেন আর বাতাসে আঁকিবুকি কাটেন।

তবু রামবাবুর কাছে পাঁচটা গাঁ-গঞ্জের লোক আসে এবং যাতায়াত করে। তার কারণ, রামবাবু মাঝেমধ্যে ফস্ করে এমন এক-একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেন যা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়। তাঁর মুখ থেকে যদি কখনও ওরকম এক-আধটা কথা বেরিয়ে পড়ে সেই আশায় অনেক দূর-দূর থেকে লোক এসে তাঁর বাড়িতে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে।

এই তো মাত্র বছর-দুই আগে ফটিক কুণ্ডুর দেউলিয়া হওয়ার দশা হয়েছিল। ফটিক রামবাবুর বাড়ির মাটি কামড়ে দিন-রাত পড়ে থাকত। অবশেষে একদিন রামবাবু রাত বারোটায় বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে কাটতে ঘরের বাইরে এলেন। বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে ফটিক বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। রামবাবু তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, “ফটিক, বাড়ি যাও। পরশুদিন বেলা বারোটার মধ্যে খবর পেয়ে যাবে।”

শশব্যস্তে ফটিক বলল, “কিসের খবর?”

“যে- খবর পাওয়ার জন্য হাঁ করে বসে আছ। যাও, ভাল করে খেয়েদেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে। রাহু ছেড়েছে, বৃহস্পতির বাঁকা ভাব সোজা হয়েছে, আর চিন্তা কী?”

রামবাবুর কথা একেবারে সোনা হয়ে ফলল। পরের-পরের দিন দশটা নাগাদ ফটিকের লটারি জেতার খবর এল। দু’লাখ টাকা। এখন ফটিকের পাথরে পাঁচ কিল। সেই টাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করে এখন ফলাও অবস্থা, বোল-বোলাও ব্যাপার।

চৌধুরী বাড়ির নতুন জামাই এক দুপুরে শ্বশুরবাড়িতে খেতে বসেছে। রামবাবু রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে সোজা জামাইয়ের সামনে হাজির। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, “চৌধুরীমশাই, দিব্যি জামাইটি হয়েছে আপনার। ফরসা রং, রাজপুত্তুরের মতো মুখ, টানা-টানা চোখ, দু’খানা হাত, কিন্তু পা কি একখানা কম?”

নগেন চৌধুরী এমনিতেই রামবাবুকে পছন্দ করেন না, তার ওপর তাঁর এই উটকো আগমনে তিনি চটে গিয়ে বললেন, “একখানা পা মানে? খোঁড়াখুঁতো জামাই শস্তায় ঘরে এনেছি বলে ভাবছ? নগেন চৌধুরী অত পিচেশ নয়। নগদ দশটি হাজার টাকা বরপণ, একখানা মোটর সাইকেল, রেডিও, চল্লিশ ভরি সোনা, আলমারি, ফার্নিচার...বুঝলে! জামাই শস্তায় হয়নি। বাইরে তোমরা কেপ্পন বলে আমার বদনাম রটাও, সে আমি জানি।

তা বলে এত কেপ্পন নই যে, কানা-খোঁড়া ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দেব। ও জামাই, এই বেয়াদবটাকে তোমার দুটো ঠ্যাং বের করে দেখিয়ে দাও তো!”

জামাই কিছু হতভম্ব হয়ে বিচি সমেত একটা কাঁটালের কোয়া গিলে ফেলল। তারপর ভয়ে-ভয়ে দুটো পা বের করে দেখাল।

রামবাবু বিমর্ষ হয়ে বললেন, “নাঃ, ডান ঠ্যাংটা তো হাঁটুর নীচ থেকে নেই দেখছি। তাতে অবশ্য তেমন ক্ষতি নেই, এক ঠ্যাঙেই দিব্যি কাজ চলে যাবে।”

নগেন চৌধুরী মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, “চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ দুটো ঠ্যাং)! তবু বলছ!” বলেই গলা একটু নামিয়ে বললেন, “কী বলতে চাও সে আমি বুঝেছি। এই কথাই তো বলতে চাইছ যে, বাপ-মা মরা ভাইঝিটাকে কেন ধরেবেঁধে ওই কানা সাতকড়ির সঙ্গে বিয়ে দিলাম! ওরে বাবা, সে কি আর শস্তা খোঁজার জন্য! গাঁয়ের পাঁচটা লোক জানে বিয়ের রাতে দশরথ দত্ত নগদ পাঁচ হাজারের জন্য অত চাপাচাপি না করলে ঘটনাটা ঘটতই না। দশরথ দেমাক দেখিয়ে ছেলে তুলে নিয়ে গেল, তখন মেয়েটা লগ্নভ্রষ্টা হয় দেখে কানা সাতকড়ির সঙ্গে বিয়ে দিই। তবে আমি জানি, লোকে কথাটা বিশ্বাস করে না। তারা বলে বেড়ায়, দশরথের সঙ্গে নাকি আমি আগেই সাঁট করে রেখেছিলাম, আর সাতকড়ির সঙ্গেও নাকি বোঝাঁপড়া ছিল। আমার কুচ্ছো গাইতে হলধর গায়েন পালা অবধি বেঁধে শিবরাত্তিরের মেলার সময় আসর জমিয়েছিল। ছিঃ, ছিঃ কী বদনামই না করতে পারো তোমরা!”

রামবাবু এত কথা কানে নিলেন না। দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “ঠ্যাং একটাই, তাতে ভুল নেই। সামনের অমাবস্যার পর বিয়ে হলে এ-জামাই আপনি অনেক শস্তায় পেতেন। একেবারে জলের দর।”

এই ঘটনার দু’দিন পর অমাবস্যা ছিল। নগেন চৌধুরীর জামাই শিমুলগড়ে গাড়ি ধরতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে ডান পা খোয়াল। এখন ক্রাচ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বুড়ো গৌরগোবিন্দর বয়স বিরানব্বই পেরিয়ে তিরানব্বইতে পড়ল। গত দশটি বছর গৌরগোবিন্দ ধৈর্য ধরে আছেন যদি তাঁর সম্পর্কে এক-আধটা কথা রামের মুখ থেকে বেরোয়। আজ অবধি বেরোয়নি। গৌরগোবিন্দ সকালে উঠে পান্তাটি খেয়েই একখানা মাদুর বগলে করে এসে রামবাবুর দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় চেপে বসে যান। গ্রীষ্মে ফুরফুরে বাতাস থাকে, শীতে থাকে রোদ। বসে দিব্যি আরামে ঝিমুনি এসে যায়। দুপুরে নাতনি এসে ডাকলে গিয়ে চাট্টি ভাত খেয়ে নেন, তারপর একখানা বালিশ বগলে করে নিয়ে এসে এখানেই দিবানিদ্রাটি সেরে নেন। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যান। একেবারে রুটিন। নিবারণ পুততুন্ড একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "গৌরদাদু, বিরানব্বই পেয়ে বার পরও কি মানুষের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে?"

গৌরগোবিন্দ একঝুড়ি আসল দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন, "ওরে, আমি যে আর মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি বাঁচব না সে আমিও জানি। তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব?"

এ-কথার পর আর কার কী বলার থাকতে পারে?

আজ ভোরবেলায় গৌরগোবিন্দ যথারীতি দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে আছেন। দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে। শরৎকালের মিঠে রোদটাও পড়েছে পায়ের ওপর। কিন্তু গৌরগোবিন্দের আজ ঝিমুনিটা আসতে চাইছে না। কাল রাতে গাঁয়ে চোর ঢুকেছিল, সেই খবরটা পাওয়া ইস্তক মনটা কেমন চুপসে গেছে। বেশ বুকের পাটাওয়ালা চোর, ঢুকতে গেছে গগন সাঁপুইয়ের বাড়ি। আর কে না জানে যে, গগন সাঁপুই হল সাক্ষাৎ কেউটে? তবে চোর ধরা পড়ার একটা ভাল দিকও আছে। সেইটেই ভাবছিলেন তিনি।

উঠোনের আগড় ঠেলে নটবর ঘোষকে ঢুকতে দেখে গৌরগোবিন্দ খুশি হলেন। গাঁয়ের পাঁচটা খবর এবং পাঁচ গাঁয়ের খবর ওর কাছেই পাওয়া যায়। বছর দুই আগে নটবর ঘোষের জ্যাঠা পাঁচুগোপাল মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে সদরে যাচ্ছিল,. স্টেশনে রাম বিশ্বেসের সঙ্গে দেখা হতেই রাম বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে কাটতে বলল, "খুব যে যাচ্ছ!

বলি উইল-টুইল করা আছে? আর উইল করেই বা কী হবে। তোমার ধনসম্পত্তি তো পিঁপড়েরা খাবে বাবা। তবে একটা কথা, খুব দুর্যোগ হবে, বুঝলে! ভয়ানক দুর্যোগ। রেলগাড়ি অবধি না ভেসে যায়!”

পাঁচগোপালের জরুরি মামলা। রামের কথায় কান দেওয়ার ফুরসত নেই। তাই পাত্তা দিল না। সেই রাতে সত্যিই ভয়ঙ্কর দুযোগ দেখা দিল। যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি। রাত দশটার আপ ট্রেন শিমুলগড়ে ঢোকার মাইল দুই আগে কলস নদীর ব্রিজ ভেঙে স্রোতে খানিকটা ভেসে গেল। সাক্ষ্য দিয়ে পাঁচুগোপাল আর ফিরল না। কিন্তু মুশকিল হল, চিরকুমার। পাঁচুগোপালের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশান হল নটবর ঘোষ। হলে কী হয়, পাঁচুগোপালের টাকাপয়সা আর সোনাদানা সব লুকিয়ে রাখা আছে। কাকপক্ষীতেও জানে না। কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা শিবের অসাধ্য। পাঁচুগোপাল জ্যাঠার লুকনো সম্পত্তির হদিস করতে নিত্যি এসে এখানে ধরনা দেয়। কিন্তু সুবিধে হয়নি। রাম গুপ্তধনের ব্যাপারে একেবারে চুপ। নটবর একবার কালী কাপালিকের কাছেও গিয়েছিল। কালী নরকরোটিতে করে সিদ্ধি খেতে-খেতে হাঃ হাঃ করে হেসে বলেছিল, “আপনার জ্যাঠার ভূত তো নিত্যি আমার কাছে আসে। সুলুকসন্ধান সবই জানি। তবে মশাই, বটতলায় মায়ের থানটা আগে বাঁধিয়ে দিন, গুপ্তধনের হদিস একেবারে হাতে-হাতে দিয়ে দেব। আপনার জ্যাঠারও তাই ইচ্ছে কিনা।”

মায়ের থান বাঁধানোর কথায় নটবর পিছিয়ে গেলেন। এখনও পিছিয়েই আছেন। কালী কাপালিক মাঝে-মাঝেই হানা দিয়ে বলে যায়, “মশাই, কাজটা কিন্তু ভাল করছেন না। আপনার জ্যাঠা কুপিত হচ্ছেন। কটা টাকাই বা লাগবে? গোটা কয়েক ইট, এক চিমটি সিমেন্ট আর একটা রাজমিস্ত্রির একটুখানি যা খরচ, তার বদলে সাত-আট লাখ টাকার সোনাদানা–এ-সুযোগ কেউ ছাড়ে!”

গৌরগোবিন্দ হাতছানি দিয়ে নটবরকে ডাকলেন। “গৌর-ঠাকুরদা যে।” বলে নটবর এসে মাদুরের এককোণে চেপে বসে বললেন, “আচ্ছা ঠাকুরদা, এই বয়সে এই পাকা আপেলটির মতো চেহারা নিয়ে ঘুরতে তোমার লজ্জা হয় না? এখনও বত্রিশ পাটি দাঁত,

মাথাভর্তি কালো চুল, টান চামড়া, বলি বুড়ো হচ্ছ না কেন বলো তো! এ তো খুব অন্যায্য কাজ হচ্ছে ঠাকুরদা! প্রকৃতির নিয়মকানুন সব উলটে দিতে চাও নাকি? সেটা যে গর্হিত ব্যাপার হবে!"

গৌরগোবিন্দ একগাল হেসে বললেন, "হব রে বাবা, আমিও বুড়ো হব। আর বিশ-পঁচিশটা বছর একটু সবুর কর, দেখতে পাবি। সব ব্যাপারেই অত তাড়াহুড়ো করতে নেই। কত সাধ-আহ্লাদ শখ-শৌখিনতা বাকি রয়ে গেছে আমার!"

নটবর চোখ কপালে তুলে বলেন, "এখনও বাকি! তা বাকিটা কী-কী আছে বলো তো ঠাকুরদা?"

"আছে রে আছে। এই ধর না, আজ অবধি কাশী গিয়ে উঠতে পারলাম। তারপর ধর, এখনও আমার বত্রিশটা মামলার রায় বেরনো বাকি। তারপর ধর, সেই ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, হলদে চিনি দিয়ে বাঁকিপুরের ক্ষীর নাকি অমৃত-তা সেটাও আজ অবধি চেখে দেখিনি। তারপর ধর, ফিবছর যেসব লটারির টিকিট কাটছি তার একটাতেও প্রাইজ মারতে পারিনি। তারপর রাঙি গাইটার দুধ খাওয়ার জন্য কবে থেকে আশা করে আছি, দেবে-দেবে করছে, দিচ্ছে না। আরও কত আছে। তা সব একে-একে হোক। তারপর ধীরেসুস্থে বুড়ো হওয়ার কথাবব খন। অত হুড়ো দিসনি বাপ।"

"কিন্তু বয়সটা কত হল সে-খেয়াল আছে?"

গৌরগোবিন্দ খাড়া হয়ে বললেন, "আমার বয়সটার দিকে তোদের অত নজর কেন রে? নিবারণ যে একশো পেরিয়ে এক গণ্ডা বছর টিকে দিব্যি হেসেখেলে পাঁঠার মুড়ো চিবিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা তোদের পোড়া চোখে পড়ে না নাকি? কুঞ্জপুরের শৈলেন ঘোষ-সেও কি কম যাচ্ছে! আমার হিসাবমতো তার এখন একশো সাত। তা শৈলেন বাকিটা রাখছে কী বল তো! গেল হপ্তায় নবাবগঞ্জে হাট করতে এসে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে গেল, নিজের চোখে দেখা। পরশুদিন সারা রাত জেগে কলসি গাঁয়ে ভট্ট অপেরার যাত্রা দেখেছে, দু'মাস

আগেও ফুটবল মাঠে গিয়ে কুঞ্জপুরের হয়ে মেলা নাচানাচি করে এসেছে-তা এদের বেলায় কি চোখ বুজে থাকিস?"

নটবর ঘোষ সবেগে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, "ওটা কাজের কথা নয়। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। তোমার মধুগুলগুলি গাছের আমগুলো যদি জষ্টি মাসে না পাকে তবে কি তুমি খুশি হও? খেতের ধান সময়মতো না পাকলে তোমার মেজাজখানা কেমনধারা হবে বলো তো! এও হচ্ছে সেই কথা। তিরানব্বই বছর বয়সে বত্রিশখানা দাঁত, টানটান চামড়া, মাথা ভর্তি চুল নিয়ে গটগট করে ঘুরে বেড়াচ্ছ-তোমার আক্কেলটা কী বলো তো! আম পাকে, ধান পাকে, আর মানুষ পাকবে না?"

গৌরগোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মধুগুলগুলি আমের কথা বলে খারাপ করে দিলি তো মেজাজটা। গাছ কেঁপে আম এসেছিল এবার। চোর-ছোঁড়াদের জ্বালায় কি একটাও মুখে দিতে পেরেছি! কী চোরটাই হয়েছে গাঁয়ে বাপ। তোরা সব করিসটা কী? এই তো গগনের বাড়ি কাল অতবড় চুরিটা হয়ে গেল! শিমুলগড় কি চোরের মামাবাড়ি হয়ে উঠল বাপ? তা চোরটাকে তোরা করলি কী?"

এবার নটবর ঘোষের দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেঁটমুণ্ড হয়ে সে বলল, "সে-কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না ঠাকুরা। গগনের

নাকি দয়ার শরীর, চোরের দুঃখে তার প্রাণটা বড় কেঁদেছিল। তাই ছেড়ে দিয়েছে।"

গৌরগোবিন্দ ফের খাড়া হয়ে বসে চোখ কপালে তুলে বলেন, "অ্যাঁ! ছেড়ে দিয়েছে! সে কী রে! একটা আস্ত চোরকে ছেড়ে দিলে!"

"চোরটা নাকি বড় কান্নাকাটি করছিল, তাইতে বাড়ির বারও ঘুম হচ্ছিল না। তাই নাকি ছেড়ে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে।"

গৌরগোবিন্দ মুখে একটা আফসোসের চুক-চুক শব্দ করে বললেন, “ইস! এ তো বড় ক্ষতি হয়ে গেল দেখছি! শিমুলগড়ের একটা নিয়ম আছে তো রে বাপ। সেই পুরনো আমল থেকে প্রথা চলে আসছে, চোর ধরা পড়লে তাকে দিয়ে যত পারো বেগার খাঁটিয়ে নাও। খেতে নিড়েন দেওয়াও, খানিকটা মাটি কুপিয়ে নাও, বাড়ির পানাপুকুরের পানা পরিষ্কার করাও, আগাছা সাফ করিয়ে নাও, এমনকী আগের দিনে বুড়ো বুড়িরা চোরকে দিয়ে পাকা চুলও বাছিয়ে নিত। আমি তো চোরের খবর শুনে ঠিক করে রেখেছি, তিনটে গাছের নারকোল পাড়িয়ে নেব, পাঁচখানা বড়-বড় মশারি কাঁচাব, কুয়োর পাড়টা পিছল হয়েছে, সেটা ঝামা দিয়ে ঘষিয়ে নেব, আর গোয়াল ঘরখানা ভাল করে সাফ করিয়ে নেব। না না, গগন কাজটা মোটেই ভাল করেনি।”

মুখোনা বেজার করে নটবর ঘোষ বলল, “চোরটার সঙ্গে আমারও একটু দরকার ছিল। এ-চোর তো যে-সে চোর নয়। গগনের বাড়ি হল কেল্লা। তার ওপর পাইক আছে, কুকুর আছে, লোক-লস্কর আছে। সেসব অগ্রাহ্যি করে চোর যখন গগনের বাড়ি ঢুকে সিন্দুক ভেঙে জিনিস হাপিস করেছে তখন একে ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতেই হয়। আমি তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছি, জ্যাঠার ধনসম্পত্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে তা একে দিয়েই খুজিয়ে বের করব। এর যা এলেম এ ঠিক পারবে। তা বরাতটাই আমার খারাপ। সকালে চোরের সন্ধানে গিয়ে শুনি, এই বৃত্তান্ত।”

গৌরগোবিন্দ দুঃখ করে বললেন, “এঃ, কতবড় সুযোগটা হাতছাড়া হল বল তো! আমার পাঁচ-পাঁচখানা মশারি কাঁচা হয়ে যেত, ঝুনো নারকোলগুলো গাছ থেকে নামানো যেত, তোর জ্যাঠার ধনসম্পত্তিরও একটা সুলুকসন্ধান এই ফাঁকে হয়ে যেতে পারত। আজকাল ভাল চোর পাওয়া কি সোজা কথা রে! এখনকার তো সব ছ্যাঁচড়া চোর। আগের দিনে চুরিটা ছিল এক মস্ত বিদ্যে। নিধে চোর, সিধু চোর, হরিপদ চোরকী সব চোর ছিল সে আমলে! কত মন্তর-তত্তর জানত, হাতের কাজ ছিল কত সাফ, তেমনই ছিল বুদ্ধি আর সাহস। সবই দিনকে দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে।”

বিরক্ত মুখে নটবর বলে, "এমন ঠ্যাটা জ্যাঠাও কি কখনও কেউ দেখেছ? আমরা দুটি ভাই সেই কবে থেকে জ্যাঠার সম্পত্তি তাক করে বসে আছি, অথচ টাকা-পয়সা নিয়ে একটা শ্বাস অবধি ফেলে গেল না! কেবল বলত, যদি সজ্জন হও, যদি দয়ালু হও, যদি ভাল লোক হয়ে উঠতে পার, তবে ঠিক খুঁজে পাবে। তা আমরা কি কিছু খারাপ লোক, বলো তো ঠাকুরদা?"

গৌরগোবিন্দ মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ওইটেই তো পাঁচুগোপালের দোষ ছিল রে, বড্ড বেশি ভালমানুষ। কলিযুগে কি অত বেশি ভাল হলে চলে! একটি মিথ্যে কথা বলবে না, অন্যের একটি পয়সা এধার-ওধার করবে না, কথা দিলে প্রাণপণে কথা রাখবে, ছলচাতুরির বালাই নেই, বাবুগিরি নেই, মাছমাংস অবধি খেত না, গরিবকে দুহাতে পয়সা বিলোত–এসব করেই তো বারোটা বাজাল তোদের। সেই পাপের শাস্তিও তো ভগবান হাতে-হাতে দিলেন, কলস নদীতে রেলগাড়ি ভেসে গেল, লাশটা অবধি পাওয়া গেল না।"

নটবর মাথা নেড়ে বলে, "আমরাও সেই কথাই বলি, অতি ভাল তো ভাল নয়। এই আমার কথাই ধরো না কেন, আমি ভাল বটে, কিন্তু জ্যাঠার মতো আহাম্মক তো নই। এই তো গতকালই মাছওয়ালা নিতাই প্রামাণিকের কাছ থেকে সাত টাকার মাছ কিনে দাম দিতে দশটা টাকা দিয়েছি। তা নিতাই তখন খদ্দের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, ভুল করে তিন টাকার বদলে সাত টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে। আমিও কথাটি না বলে টাকাটি ট্যাঁকে খুঁজে চলে এলাম। কারণ কী জানো? ওই ভুলটা হয়তো বা গ্যলক্ষ্মীরই কৃপা! নিতাই ওজনে ঠকায়, চড়া দাম হাঁকে, তারও একটা কর্মফল হয়তো ওই সাত টাকায় কাটল, কী বলো? জ্যাঠা হলে ২৪

আহাম্মকের মতো দরকার হলে বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে আসত। এই যে.আমি বন্ধক রেখে লোককে টাকা ধার দিই, জ্যাঠা এটা একদম সহ্য করতে পারত না। কিন্তু কাজটা কি খারাপ? গরিব-দুঃখী ঘটিটা, বটিটা, আংটিটা, দুলটা বন্ধক রেখে টাকা নেয়,

এতে অধর্মের কী আছে বলো! এ তো এক ধরনের পরোপকারই হল। তাদেরও পেট ভরল, আমারও সুদ থেকে দুটো পয়সা হল।”

গৌরগোবিন্দ একগাল হেসে গলাটা একটু খাটো করে বললেন, “তা সোনাদানা কেমন কামালি বাপ? এক-দেড়শো ভরি হবে?”

নটবর লজ্জায় নববধূর মতো মাথা নামিয়ে বলে, “অত নয়। তবে তোমাদের আশীর্বাদে খুব খারাপও হয়নি।”

এই সময়ে উঠোনের আগড় ঠেলে লম্বা-চওড়া একটা লোক ঢুকল। খালি গা, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, হাতে একখানা পেতলের গুল বসানো লম্বা লাঠি।

গৌরগোবিন্দ সচকিত হয়ে বলেন, “কে রে ওটা?”

“ঘাবড়াও মাত ঠাকুরদা, ও হল গগনের পাইক। ওরে ও লক্ষ্মণ, বলি খবর-টবর আছে কিছু?”

লক্ষ্মণের মুখোনা কেমন ভ্যাবলামতো। চোখে-মুখে কেমন একটা ভয়-খাওয়া ভাব। কাছে এসে যখন দাঁড়াল তখনও একটু হাঁপাচ্ছে। ভাঙা গলায় বলল, “আচ্ছা, এই গাঁয়ে কি খুব ভূতের উপদ্রব আছে মশাই?”

গৌরগোবিন্দ ফের খাড়া হয়ে বললেন, “ভূত তো মেলাই আছে বাপু। শিমুলগড়ের ভূত তো বিখ্যাত। কিন্তু তোমাকে হঠাৎ ভূতে পেল কেন? কিছু দেখেছ-টেখেছ নাকি?”

লক্ষ্মণ একটু মাথা চুলকে বলল, “আজ্ঞে, সেটা বলতে পারব না। বলা বারণ। তবে সেটা বড় অশৈলী কাণ্ড।”

গৌরগোবিন্দ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, “পেটে কথা রাখতে নেই। কথা রাখলেই পেটের গণ্ডগোল হয়। কলেরা অবধি হতে দেখেছি।”

লক্ষ্মণ একটু ভড়কে গিয়ে বলে, "কলেরা!"

"কলেরা, সান্নিপাতিক, শূলব্যথা। কী বলিস রে নটবর?"

"একেবারে নিয্যস কথা। আরে লক্ষ্মণভায়া, দাঁড়িয়ে কেন? বোসো, বোসো। আমরা তো সবাই তোমার কথা বলাবলি করি। হ্যাঁ বটে, গগন এতদিনে পয়সা খরচ করে একখানা লোক রেখেছে বটে। যেমন তেজ তেমনই সাহস। বুঝলে গৌরঠাকুরদা, কালকের চোরটাকে তো এই লক্ষ্মণই সাপটে ধরেছিল। নইলে সে কি যে-সে চোর, ঠিক পাঁকাল মাছটির মতো পিছলে বেরিয়ে যেত থলিটি নিয়ে। লক্ষ্মণ খুব এলেমদার লোক। কাছে-পিঠে এমন একখানা লোক থাকলে বল-ভরসা হয়।"

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাদুরের এককোণে বারান্দা থেকে পা ঝুলিয়ে বসল। কাঁধের গামছা দিয়ে কপালটা একটু মুছে নিয়ে বলল, "আমার সাহসের কথা আর বলবেন না, গায়ের জোরের কথাও আর না তোলাই ভাল। কাল রাতে যাকাণ্ড হল, যত ভাবছি তো বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। গগনবাবুর চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এ-গাঁয়ে আর নয়।"

গৌরগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, "ভুল করছ হে বাপু। এ-গাঁয়ের জল-হাওয়া খুব ভাল। কত লোক এখানে হাওয়া বদলাতে আসে। আর ভূতের কথা যদি বলো তো বলি, শিমুলগড়ের ভূতের যে এত নামডাক, তাও তো এমনই নয়। এমন ভদ্র, পরোপকারী, ভাল আর শান্ত ভূত আর কোথাও পাবে না। বিশেষ করে বাইরের লোকের সঙ্গে বেয়াদবি করাটা তাদের রেওয়াজই নয়। তবে হ্যাঁ, বিশেষ কারণ থাকলে অন্য কথা। আর নতুন ভূতেরা একটু-আধটু মজা করে বটে, তবে সেটা ধরতে নেই।"

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, "না না, নতুন ভূত নয়। ইনি পুরনো ভূত। গায়ে পেল্লায় জোর।"

নটবর চোখ কপালে তুলে, "ভূতের গায়ে জোর! সে কী গো! ভূত তো শুনেছি বায়ুভূত জিনিস। ধোঁয়া বা গ্যাস জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি ফঙ্গবেনে ব্যাপার। তা গায়ের জোরটা বুঝলে কী করে? ভূতের সঙ্গে কুস্তি করলে নাকি?"

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি নিজের দু কান স্পর্শ করে জিভ কেটে বলে, "তেনার সঙ্গে কুস্তি যেন কখনও করতে না হয়, এই আশীবাদটুকু করবেন। যা একটু ছোটখাটো ঝাঁকুনি দিয়েছেন তাতেই হাড়গোড় কিছু আলগা হয়ে রয়েছে। সারা রাত্তির ঘুমোতে পারিনি। রামবাবুর কাছে ব্যাপারটা বলে একটা নিদান নিতেই আসা।"

গৌরগোবিন্দ আরও একটু ঝুঁকে বলেন, "তা ভূতের সঙ্গে তোমার লাগল কী নিয়ে? শিমুলগড়ের ভূতেরা তো বাপু সাত চড়ে রা করে না। তা ইনি কুপিত হলেন কেন? বাসী কাপড়ে বটতলায় যাওনি তো! এঁটো মুখে তুলসীগাছ ছোঁওনি তো! না কি অন্য কোনও অনাচার!"

লক্ষ্মণ হতাশ গলায় বলে, "না গো বুড়োবাবা, ওসব অনাচার কিছুই করিনি। দোষের মধ্যে মনিবের হুকুম তামিল করতে গিয়েছিলাম। আমার কী দোষ বলো! মানছি যে, চোরটাকে মারধর করা ঠিক কাজ হয়নি। চোরটারও মতিভ্রম, পালানোর চেষ্টাই বা কেন করল কে জানে! তবে এটুকু বলতে পারি বুড়োবাবা যে, সে মরেনি। যখন তাকে বটতলার মাঠে নিয়ে ফেললুম তখনও বুক ধুকপুক করছিল।"

নটবর ঘোষ উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, "অ্যাঁ! বটতলার মাঠে নিয়ে ফেললে, মানে! ফেলার মতো কী হল?"

গৌরগোবিন্দও বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, "চোর কি ফ্যালনা জিনিস হে! অমন জিনিস হাতের মুঠোয় পেয়েও কেউ হাতছাড়া করে! কত কাজ হয়ে যেত! তা ফেলতে গেলে কেন বাপু? জন্মেও শুনিনি কেউ কখনও চোর ফ্যালে।"

লক্ষ্মণ যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। মুখোনা ফ্যাকাসেপানা দেখাচ্ছে। আমতা-আমতা করে বলে, "চোর যে ফ্যালনা জিনিস নয় তা এখানে এসেই শিখলাম মশাই। নাক মলছি, কান মলছি, আর ইহজীবনে চোরকে হেলাফেলা করব না। রাতের তিনিও সে কথাই বলছিলেন কিনা!"

গৌরগোবিন্দ একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তা এই তেনাকে কেমন দেখলে বলল তো! পুরনো ভূত সব ক'জনকেই চিনি। বলি তিনুকে দ্যাখোনি তো! তিনুর গায়েও সাঙ্ঘাতিক জোর ছিল, মুগুরের বদলে রোজ সকালে দু খানা আস্ত ঢেঁকি দু হাতে নিয়ে বনবন করে ঘুরিয়ে মুগুর ভাঁজত। তবে বড্ড গবেট ছিল, খুব ভিতুও। গায়ে জোর থাকলে কী হয়, কেউ চোখ রাঙালেই লেজ গুটোত।"

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, "তা হলে ইনি তিনি নন। চুরি নিয়ে যখন আমাকে জেরা ছিলেন, তখনই বুঝেছিলাম এর খুব বুদ্ধি।"

নটবর বলল, "চুরি নিয়ে কী জেরা করল হে?"

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। তবে সে মশাই অনেক কথা। আমি বড্ড ভয় পেয়েছি। লক্ষ্মণ পাইকের বুকে ভয় বলে বস্তু ছিল না কখনও। কাল রাত থেকে হল। এখানে আমার আর পোষাবে না মশাই। রামবাবুর কাছে তাই হাতটা গোনাতে এসেছি।"

শুনে গৌরগোবিন্দ খুব অট্টহাসি হেসে বললেন, "কত বছর রামের পেছনে ফেউ হয়ে লেগে আছি জানো? আজ অবধি মুখের কথাটি খসাতে পারিনি। তবে বেড়ালের ভাগ্যে কারও কারও শিকে ছেড়ে দেখেছি। তোমারও কপাল ভাল থাকলে রামের মুখ থেকে বাক্যি বেরোবে।"

এমন সময় উঠোনের অন্যদিককার একখানা ঘরের দরজা খুলে রাম বিশ্বাস বেরিয়ে এলেন। ডান হাতে অবিরল ঢাড়া কেটে যাচ্ছেন, আর মুখে অনর্গল বিড়বিড়।

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জোড়হাতে রামবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার সমস্যার একটা বিহিত করে দেন আজ্ঞে। আমার বড় বিপদ যাচ্ছে।"

রামবাবু কুঁচকে লক্ষ্মণের দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, “ক’দিন শ্রীঘর বাস করা হয়েছে বলো তো! বছর পাঁচেক নাকি?”

লক্ষ্মণ এত ঘাবড়ে গেল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। চোখ দুটো কেমন গোল্লা পাকিয়ে গেল ভয়ে। তারপর একটু ভাঙা গলায় বলল, “মোট তিন বছর। সবই তো আপনি জানেন, লুকোছাপা করব না। জেল যে খেটেছি তা পুরো নিজের দোষে নয়। লালু দাসের দলে ভিড়েছিলুম পেটের দায়ে। ঘরে বুড়ো বাপ, রোগা মা, তিনটে আইবুড়ো বোন, কী করব বলুন। মোট চারটে ডাকাতিতে ছিলুম বটে, কিন্তু দলে থাকাই সার। আমাকে তেমন দায়িত্বের কাজ দিত না, শুধু বাইরে পাহারায় রাখত। শেষে নারায়ণপুরে লালু ধরা পড়ল। মামলায় মোট পাঁচ বছর জেল হল তার। তা লালু দাসের মতো লোকেরা কি আর জেল খাটে! আমাকে ডেকে বলল, তোকে মাসে-মাসে চারশো করে টাকা দেব, আমার হয়ে জেল খাটবি।’ পেটের দায়ে রাজি হয়েছিলাম। তবে পুরো মেয়াদ খাটতে হয়নি। তিন বছর পর ছেড়ে দিল। লালু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বদনামের ভাগী হলাম গে আমি। নিজের গাঁয়ে অবধি ঢুকতে পারি না।”

রামবাবুর চেহারাটি ছোটখাটো, রংখানা ফরসা, মাথায় একটু টাক, তিনি অতি দ্রুত বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে কাটতে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে আপনমনে বললেন, “একজনের নামের আদ্যক্ষর ন। আর-একজনের দুটো হাতই বাঁ হাত। হুঁহু, হুঁহু, এ তো ঘোর বিপদের লক্ষণ দেখছি। অর্থই অনর্থের মূল।”

কথাটা কাকে বলা তা বোঝা গেল না ঠিকই। কিন্তু সবাই একটু তটস্থ হল। নটবর, গৌরগোবিন্দ এবং লক্ষ্মণ ছাড়াও দশ বারোজন মানুষ ইতিমধ্যেই উঠোনের চারদিকে জমায়েত হয়েছে। সবাই এদিক-ওদিক চাওয়াচাওয়ি করছে। বিপদের কথায় সকলেরই মুখ শুকনো। এর মধ্যেই লক্ষ্মণ হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে সোজা গিয়ে নটবর ঘোষের সামনে দাঁড়িয়ে বাঘের গলায় গর্জন করে উঠল, “নটবরবাবু।”

লক্ষ্মণের এই চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে নটবর ঘোষ বললেন, “অ্যাঁ!”

"আপনার নামের আদ্যক্ষর ন।"

নটবর বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, "কে বলল ন?"

"আপনি নটবর।"

নটবর সবেগে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, "কখনও নয়। ভুল শুনেছ ভাই। আমার নাম হল গে হলধর। বিশ্বাস না হয় এই গৌর ঠাকুরদাকেই জিজ্ঞেস করো।"

লক্ষ্মণ পাইক তার দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, "চালাকি হচ্ছে? আমি নিজের কানে শুনেছি আপনার নাম নটবর।"

নটবর দাওয়ার ভেতর দিকে সরে বসে বলে, "আহা হা, অত খেপছো কেন ভায়া, নটবর বলে মাঝে-মাঝে ভুল করে কেউ-কেউ ডাকে বটে, তবে দেখতে হবে যে, কোন ন। মূর্ধণ না দন্ত্য ন। তোমাকে কিন্তু আগেভাগেই বলে রাখছি বাপু, দন্ত্য ন হলে কিন্তু মিলবে না। আমার নটবর হল মূর্ধণ দিয়ে। যাও না, ওই রামের কাছেই জেনে এসো না কোন ন।"

"আপনার হাত দুটো দেখি। আমার মনে হচ্ছে আপনার দুটো হাতই বাঁ হাত।"

নটবর তার হাত দুখানা পিছমোড়া করে রেখে আতঙ্কের গলায় বলে, "মোটেই নয় বাপু। আমার বাঁ হাতই নেই। দুটোই ডান হাত।"

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ কাছেপিঠে প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের শব্দের মতো শব্দ হল, "ব্যোম...ব্যোম...ব্যোম কালী! খেয়ে লে মা, সব খেয়ে লে! সব খেয়ে ফ্যাল বেটি করালবদনী। গরিব বড়লোক, সাধু-চোর, কালোধলো–সব ব্যাটাকে ধরে খেয়ে লে মা জননী। কড়মড়িয়ে খা মা, চিবিয়ে-চিবিয়ে খা, ছিবড়ে ফেলিসনি মা। সব গাপ করে দে।"

ওই বিকট শব্দে লক্ষ্মণ পাইক অবধি ঘাবড়ে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে ছিল। সেই ফাঁকে নটবর ঘোষ দাওয়া থেকে নেমে সুট করে কচুবনের ভেতরে সেঁদিয়ে পালিয়ে গেল।

কালী কাপালিক রাম বিশ্বাসের বাড়িতে কখনও ঢোকে না। রামবাবুর ওপর তার একটা পুরনো রাগ আছে। বহুঁকাল আগে, কালী যখন কাপালিক হয়নি, তখন রামবাবু একবার তাকে বলেছিলেন, "ওরে, সামনের জন্মে তুই তো দেখছি বাদুড় হবি।" এই কথায় কালী প্রথমটায় ভীষণ ভয় খেয়ে যায়। অনেক কাকুতিমিনতি করতে থাকে, "ও রামবাবু, বাদুড় নয়, আমায় বরং সামনের জন্মে বানর করে দিন, তাও ভাল। বাদুড় হলে আমি মরে যাব। ও রামবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।" পঞ্চানন সরখেল কাছেই ছিলেন, তিনি বললেন, "তা বাপু কালী, বাদুড়ের চেয়ে কি বানর হওয়া ভাল? বাদুড়ের তো দুখানা ডানা আছে, কত ঘুরেটুরে বেড়াতে পারে, আর বানর তো তাঁদড়ের একশেষ। এই সেদিনও আমার বাগানের তিন কাঁদি কলার সর্বনাশ করে গেছে। এ গাঁয়ে আর বানরের সংখ্যা বাড়ানো উচিত হবে না।" কালী তখন রেগেমেগে বলল, "বাদুড় যে মুখ দিয়ে পায়খানা করে তা কি জানেন? ওয়াক থুঃ। আমি কিছুতেই বাদুড় হতে পারব না। রামবাবু, একটা ব্যবস্থা করে দিন। কুকুর-বেড়াল সব হতে রাজি আছি, শুধু ওই বাদুড়টা পারব না।" রাম বিশ্বাস অবশ্য সেকথায় কান দেননি। শুধু বলেছেন, "যা দেখতে পাচ্ছি তাই বলেছি বাপু, ওর আর নড়চড় নেই।"

সেই থেকে রামবাবুর ওপর কালীর রাগ। সে এ বাড়ির উঠোন মাড়ায় না কখনও। তবে মাঝে-মাঝে আসে আর বাইরে দাঁড়িয়ে 'ব্যোম কালী, ব্যোম কালী' করে যায়।

আজ কালীর চেহারাটা কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মাথার চুল সব ফণা ধরে আছে, দাড়ি-গোঁফ সব যেন ফুলেফেঁপে উঠেছে, রোষকষায়িত লোচন। রামবাবুর উঠোনের দিকে চেয়ে হাতের শুলখানা ওপরে তুলে বিকট স্বরে বলল, "এ-গ্রাম উচ্ছন্নে যাবে। অসুখ হয়ে মরবে, আগুন লাগবে, ভূমিকম্প হবে। এত বড় পাপের জায়গা আর নেই হে। সবার আগে যাবে ওই গগন সাঁপুই।"

কালীকে সবাই অল্পবিস্তর চেনে, তাই সবাই চুপচাপ বসে রইল। তবে লক্ষ্মণ পাইক এ-গাঁয়ে নতুন লোক। সে মনিবের নাম শুনে দু কদম এগিয়ে বলল, “কেন হে, গগন সাঁপুই আগে যাবে কেন?”

কালী অট্টহাস্য করে, “এ যে লক্ষ্মণ দরোয়ান দেখছি! বলি, আজ সকাল থেকে আমাকে যে আধসের করে দুধ পাঠানোর কথা ছিল, তার কী হল? আর মায়ের থান বাঁধানোর ইটের ব্যবস্থা? দেব নাকি সব ফাঁস করে? গগন সাঁপুইকে বলিস, কাজটা সে মোটেই ভাল করেনি। আমার আখড়ায় দেড় হাজার ভূত মন্তর দিয়ে আটকে রেখেছি। সবকটা কাঁচাখেগো অপদেবতা। একসঙ্গে যদি ছেড়ে দিই সারা গাঁ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে কিন্তু।”

রোগামতো পটল সাহা কাঁটালগাছতলায় বসে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বলে উঠল, “কিন্তু আমরা যে শুনতে পাই তোমারই নাকি বেজায় ভূতের ভয়! সেই ভয়ে তুমি শ্মশানমশানে অবধি যাও না, মড়ার ওপর বসে তপস্যা কখনও করোনি!”

কালী কাপালিক আর-একটা অট্টহাসি হেসে নিয়ে বলে, “শবসাধনা! সে আমার কোন যুগে সারা হয়ে গেছে। আর শ্মশানের কথা বলছিস! আমার যখন এইটুকু বয়স তখন থেকে রথতলার শ্মশানে যাতায়াত। নন্দ কাপালিকের সঙ্গে তো সেখানেই ভাবসাব হল, মন্তর দিলেন। বুঝলে পটলবাবু, এইজন্যেই কথায় বলে পেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমি যদি অন্য গাঁয়ের লোক হতুম, তা হলে এই তোমরাই দুবেলা গিয়ে পেন্নাম ঠুকতে। তবে আমিও ছাড়বার পাত্র নই, কালী কাপালিক যে কী জিনিস তা একদিন এ-গাঁয়ের লোককে টের পাইয়ে ছাড়ব। আরও একটা কথা পেট-খোলসা করে বলেই দিচ্ছি। পাপ কখনও গোপন থাকে না।” এই বলে কালী লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে মৃদু একটু ব্যঙ্গর হাসি হেসে বলল, “তোমার মনিবকেও কথাটা বোলো হে দরোয়ান। পাপ কখনও গোপন থাকে না। আমার কাছে সব খবরই আছে। বিকেল অবধি দেখব। যদি গগনের সুমতি হয় তবে কড়ার মতো কাজ করবে। আর যদি না করে তবে কাল সকালে সারা গাঁয়ে খবরটা রটে যাবে। থানা-পুলিশ হলে আমাকে দোষ দিয়ো না বাপু।”

কালী কাপালিক চলে গেলে সবাই একটু হাঁফ ছেড়ে নড়েচড়ে বসল।

কালী মনসাতলা পেরনোর আগেই গৌরগোবিন্দ পা চালিয়ে ধরে ফেললেন, "ওরে ও কালী, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। কথা আছে।"

কালী বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়াল, "আবার কিসের কথা!"

গৌরগোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেন, "একটু দুধের জন্য তোর এত হেনস্থা, এ যে চোখে দেখা যায় না রে! আমার কেলে গোরুর দুধ খাবি এক গেলাস? অ্যাই বড় আধসেরি গেলাস।" বলে গৌরগোবিন্দ দুই হাতে গেলাসের মাপ দেখিয়ে মিটিমিটি হাসলেন, "আর গোর দেখলেও ভিরমি খাবি। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। হাতির মতো পেল্লায় চেহারা, তেল চুকচুকে গায়ে রোদ পিছলে যায়। আর দুধের কথা যদি তুলিস বাপ, তা হলে বলব, অমন দুধ একমাত্র বুঝি রাজাগজাদেরই জোটে। যেমন ঘন, তেমনই মিষ্টি, আর তেমনই খাসা গন্ধটি! খাবি বাপ একটি গেলাস? গরম, ফেনায় ভর্তি, সরে-ভরা দুধ?"

কালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোমার মতলব আছে ঠাকুরদা।"

একগাল হেসে গৌরগোবিন্দ বলেন, "দূর পাগলা, মতলব আবার কী রে? দুটো কথা-টথা কইব বসে, সেই তো এইটুকু থেকে দেখছি তোকে। আয়, আয়।"

নিজের বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই গৌরগোবিন্দ হাঁক মারলেন, "ওরে, তাড়াতাড়ি এক গেলাস দুধ নিয়ে আয় তত! আধসেরি গেলাসে, ভর্তি করে দিস। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ এরা সব, কুপিত হলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

দাওয়ায় কালীকে আসন পেতে যত্ন করে বসালেন গৌরগোবিন্দ। দুধও এসে গেল। কালীকে দুধটা খানিক খাওয়ার সময় দিয়ে গৌরগোবিন্দ গলাটা খাটো করে বললেন, "তা হলে কথাটা আসলে এই! মানে গগন সাঁপুই একখানা দাঁও মেরেছে!"

কালী নিমীলিত নয়নে চেয়ে বলে, "দুধটি বড্ড খাসা ঠাকুরদা, এর যা দাম দিতে হবে তাও আমি জানি। শোনো, কথাটা পাঁচকান কোরো না। ও-ছোঁকরা মোটেই চোর নয়। থলির মধ্যে দুশো এগারোখানা মোহর ছিল। গগন সেটিই গাপ করেছে। ছোঁড়ার কী মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, কেন যে গগনের বাড়ি সেঁধোতে গেল।"

গৌরগোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বলেন, "দুশো এগারোখানা! দেখলি থলি খুলে?"

"থলি খুলতে হবে কেন ঠাকুরদা! আমার কি অন্তর্দৃষ্টি নেই? বাইরে থেকেই দেখলুম, থলির ভেতর মোহর। দুশো এগারোখানা। তবে ভোগে লাগল না।"

"তার মানে?"

"ছোঁকরাকে রাতেই মেরে লাশ গুম করে দিয়েছে কিনা। কাল রাতেই ছোঁকরার প্রেতাত্মা এসে বলে গেল।"

৩. নিজের নাম নিয়ে একটু দুঃখ

নিজের নাম নিয়ে একটু দুঃখ আছে অলঙ্কারের। নামটার মধ্যে কি মেয়ে-মেয়ে গন্ধ? বন্ধুরা তা বলে না অবশ্য, কিন্তু তার কেন যেন মনে হয় নামটা বড় মেয়েলি। নাম ছাড়াও আরও নানারকমের দুঃখ আছে। অলঙ্কারের। যেমন, তার গায়ে তো জোর নেই যাতে সে বুক্কাকে হারিয়ে দিতে পারে। তাকে নপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল টিমে কিছুতেই কেন যে নেয় না! তার বাবার তো পয়সা নেই যে, চাটুজ্যেবাড়ির ছেলে চঞ্চলের মতো একখানা এয়ারগান তাকে কিনে দেন। চঞ্চল তার এয়ারগানটা, অলঙ্কারকে ছুঁতেও দেয় না। অলঙ্কারের আর-একটা দুঃখ মা বাবার কাছে কিছু চাইলেই সবসময়েই শুনতে হয়, “না, হবে না। আমাদের পয়সা নেই।” নেই-নেই শুনতে-শুনতে অলঙ্কারের কান পচে গেল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বা পরশপাথর পেলে তার একটু সুবিধা হত। সে অবশ্য খুব বেশি কিছু চাইত না। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় কয়েকখানা রঙিন ঘুড়ি আর লাটাই, কয়েকটা লাট্টু, কিছু মার্বেল, পুজোয় নতুন জুতো,এইসব।

অলঙ্কারদের বাড়ি পুবপাড়ায়। দোতলা মিষ্টি একটা মাটির বাড়িতে তারা থাকে। বাড়ির সামনে একটু বাগান আর পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। দোতলার ছোট্ট একটা কুঠুরিতে অলঙ্কার একা থাকে। সেখানে তার যত বইপত্র আর কিছু খেলার জিনিস। তার বইগুলো সবই পুরনো আর ছেঁড়াখোঁড়া। উঁচু ক্লাসে যারা উঠে যায় তাদের বই শস্তায় কিনে আনেন বাবা। তার খেলার জিনিসও বেশি কিছু নেই। একটা বল, দুটো ফাটা লাটিম, তক্তা দিয়ে বানানো একটা ব্যাট, একটা গুলতি, একটা ধনুক, একটা বাঁশি। ব্যস। তার জন্মদিনও হয় না কখনও। হলে টুকটাক দু- একটা উপহার পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয়, তার যেসব বন্ধুর জন্মদিন হয়, তাদের বাড়িতে নেমন্তন্নেও যেতে পারে না অলঙ্কার। কারণ উপহার কেনার পয়সাই যে নেই তাদের।

দুঃখ যেমন আছে তেমনই কিছু সুখও আছে তার। ফুটবল খেলতে, সাঁতার কাটতে তার দারুণ ভাল লাগে। ভাল লাগে বৃষ্টি পড়লে, শীতকালে রোদ উঠলে, আকাশে রামধনু দেখলে। সকালে যখন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, তখনও তার খুব আনন্দ হয়। অলঙ্কারের আরও একটা গোপন সুখের ব্যাপার আছে। সে খুব খুঁজতে ভালবাসে। না, কোনও হারানো জিনিস নয়। সে এমনিতেই মাঠেঘাটে, জঙ্গলে, জলায় আপনমনে খোঁজে আর খোঁজে। হয়তো একটা অদ্ভুত পাথর, কখনও বা কারও হারানো পয়সা, অদ্ভুত চেহারার অচেনা গাছের চারা, ভাঙা পুতুল বা এরকম কিছু যখন পেয়ে যায় তখন খুব একটা আনন্দ হয় তার। খুঁজতে খুঁজতে এই গ্রাম আর তার আশপাশের সব অন্ধিসন্ধি তার জানা হয়ে গেছে।

আজ ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে একটা আজগুবি ব্যাপার ঘটল। নিজের দোতলা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে। এ-ঘরে জানলার বদলে ছোট ঘুলঘুলি আছে দুটো। মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়ে কে যেন তাকে বলছিল, "বাঁশঝাড়ের পেছনে যে জঙ্গলটা আছে, সেখানে চলে যাও। সেখানে একটা জিনিস আছে।"

অলঙ্কার পাশ ফিরে ঘুমের মধ্যেই বলল, "কী জিনিস?"

"দেখতেই পাবে।"

"আপনি কে?"

"আমি শিমুলগড়ের পুরনো ভূত। আমার নাম ছায়াময়।"

ভূত শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল অলঙ্কারের। সে উঠে বসল। দেখল, বাইরে ভোর-ভোর হয়ে আসছে। খুব পাখি ডাকছে। ঘুলঘুলি দিয়ে অবশ্য কাউকেই দেখা গেল না। স্বপ্ন স্বপ্নই, তাকে পাত্তা দিতে নেই। অলঙ্কারও দিল না। সে রোজকার মতো সকালে উঠে দাঁত মেজে পড়তে বসল। চাট্টি মুড়ি খেল। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে বেরোল খেলতে। আজ ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস বলে ছুটি। বেরোবার মুখেই হঠাৎ তার স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল।

বাঁশঝাড়ের পেছনের জঙ্গলে একটা জিনিস আছে! কিন্তু কীই-বা থাকবে? গতকালও ইস্কুল থেকে ফেরার পথে জঙ্গলটা ঘুরে এসেছে। প্রায়ই যায়। ওই জঙ্গলটা তার খুব প্রিয় জায়গা।

আজ পুবপাড়ায় জোর ডাংগুলি খেলা হবে। সেদিকেই মনটা টানছিল অলঙ্কারের। তবু শেষ অবধি ঠিক করল জঙ্গলটায় পাঁচ মিনিটের জন্য ঘুরে আসবে।

বাঁশঝাড়টা বিরাট বড়। একদিন নাকি এই বাঁশঝাড় তাদের বংশেরই সম্পত্তি ছিল। তবে শরিকে-শরিকে বাঁশঝাড়ের মালিকানা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হওয়ায় এখনও এটা বিশেষ কারও সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি। কেউ এখানকার বাঁশ কাটে না। ফলে ভেতরটা বেশ জমাট অন্ধকার। বাঁশপাতা পড়ে-পড়ে কার্পেটের মতো নরম একটা আস্তরণ হয়েছে মাটির ওপর। বাঁশঝাড় পেরিয়ে একটা আগাছার জঙ্গল। বড় গাছও বিস্তর আছে। এ হচ্ছে সাহাবাবুদের পোড়োবাড়ির বাগান। জঙ্গলটা অলঙ্কার নিজের হাতের তেলোর মতোই চেনে। সে চারদিকে চোখ রেখে জঙ্গলের এধার থেকে ওধার ঘুরতে লাগল। তারপর হঠাৎ মস্ত মহানিম গাছটার তলায় চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। গাছতলায় খানিকটা পরিষ্কার ঘাসজমি আছে। এখানে বসে অলঙ্কার বাঁশি বাজায় মাঝে-মাঝে। এখন সেখানে একটা লোক শুয়ে আছে। মরে গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাত হয়ে, ভাঁজ করা হাতের ওপর মাথা রেখে গুটিসুটি হয়ে শোওয়ার ভঙ্গি দেখে মারা গেছে বলে মনে হয় না। লোকটা রোগা চেহারার, লম্বা চুল আছে, গালে অল্প দাড়ি।

অলঙ্কার পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে একবার গলাখাকারি দিল। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। কাজ হল না দেখে নিচু হয়ে বলল, "আপনি কি ঘুমোচ্ছন! এখানে কিন্তু শেয়াল আছে। আর খুব কাঠপিঁপড়ে।"

হঠাৎ লোকটা চোখ চাইল। তাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেই বলল, "আ-আমি কোথায়? আমি এখানে কেন?"

অলঙ্কার একটু হেসে বলে, “আপনি এখানে কী করে এলেন তা আপনি নিজেই ভুলে গেছেন? খুব ভুলো মন তো আপনার!”

লোকটির বয়স কুড়ি বাইশের বেশি হবে না। নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “মাথাটা বোধ হয় গুলিয়ে গেছে। এখানে যে কী করে এলাম!” বলে লোকটা শুকনো মুখে অলঙ্কারের দিকে চেয়ে ফের বলে, “আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। সাঙ্ঘাতিক খিদে। কিছু খেতে দিতে পারো?”

অলঙ্কার ম্লানমুখে বলল, “তবেই তো মুশকিল। আমাদের বাড়িতে কিছু খাবার থাকে না যে! আমাদের কত খিদে পায়, আমরা তখন জল খাই খুব করে। আমাদের পাতে কিছু ফেলা যায় না বলে আমাদের বাড়িতে কাক কুকুর-বেড়ালরা পর্যন্ত আসে না। আমরা কোনও জিনিসের খোসা ফেলি না, ছিবড়ে ফেলি না। আমার বাবা সজনে ডাঁটা চিবিয়ে অবধি গিলে ফেলেন। আমি চিনেবাদাম পেলে তা ওপরের শক্ত খোসাটাসুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে নিই।”

ছেলেটা অবাক হয়ে চেয়ে ভয়-খাওয়া গলায় বলে, “ও বাবা, ওসব তো আমি পারব না। কিন্তু খিদেটা যে সহ্য করা যাচ্ছে না আর।”

“কেন, আপনার কাছে পয়সা নেই?”

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, “ছিল। এখন আর নেই। অনেক ছিল। কেড়ে নিয়েছে।”

“কে কাড়ল? ডাকাত!”

ছেলেটা ঠোঁট উলটে বলল, “তাই হবে। ভাল চিনি না। তবে তোমাদের এই অঞ্চলটাই খুব খারাপ জায়গা।”

অলঙ্কার একটু ম্লানমুখ করে বলে, “আমার বাবারও তাই মত। আপনার কি অনেক টাকা ছিল?”

ছেলেটা করুণ হেসে বলে, "হ্যাঁ, অনেক। সে তুমি ভাবতেও পারবে।"

"এখানে একটা কাশীর পেয়ারাগাছ আছে। চমৎকার পেয়ারা হয়। তবে গাঁয়ের ছেলেরা সব পেড়ে খেয়ে যায়। গতকাল দেখেছি, তিনটে অবশিষ্ট আছে। এনে দেব?"

"পেয়ারা! তাই দাও। জল পাওয়া যাবে তো!"

"হ্যাঁ। জল যত চাই। আমাদের বাড়ি ওই বাঁশঝাড়টার ওধারে। কুয়ো আছে। আগে পেয়ারা পেড়ে আনি, তারপর বাড়ি নিয়ে যাব আপনাকে।"

গাছে তিনটে পেয়ারাই ছিল। অলঙ্কার পেড়ে নিয়ে এল। বেশ বড় পাকা হলুদ পেয়ারা। ছেলেটা একটাও কথা না বলে কপকপ করে মুহূর্তের মধ্যে খেয়ে ফেলল তিনটেই। খুব খিদে পেলে খাবে বলে অলঙ্কার পেয়ারা তিনটে গাছ থেকে পাড়েনি। ভাগ্যিস পাড়েনি। খিদের যে কী কষ্ট তা তো সে জানে।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে অলঙ্কার যখন বাড়ির দিকে আসছিল তখন তার একটু ভয়-ভয় করছিল। তাদের বাড়িতে একমাত্র পাওনাদারেরা ছাড়া আর কেউ আসে না। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে কটু কাটব্য করে যায়। এ ছাড়া, কোনও অতিথি-অভ্যাগত, এমনকী আত্মীয়স্বজন অবধি কেউ আসেনি কখনও। বাইরের কোনও লোক এসে তাদের বাড়িতে খায়ওনি কোনওদিন। নিজের বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে আনতেও ভয় পায় অলঙ্কার। আজ হঠাৎ এই উটকো লোকটাকে দেখলে তার মা বাবা কি খুব রেগে যাবেন তার ওপর? তার মা বাবা খুবই রাগী এবং ভীষণ গম্ভীর। কখনও তাঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। অলঙ্কার তাঁদের একমাত্র ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সেও কখনও মা বা বাবার তেমন আদর বা আশকারা পায় না। তাদের বাড়িতে কোনও আনন্দ নেই, ফুর্তি নেই, হাসি নেই, গান নেই। এরকম বাড়িতে বাইরের কাউকে নিয়ে যেতে ভয় লাগবে না? এখন বাবা বাড়ি নেই, মা আছেন। মা যদি রেগে যান!

মা অবশ্য রাগলেন না। অলঙ্কারের রোগামতো মা কুয়োর ধারে কাপড় কাঁচতে বসেছেন। অলঙ্কারের সঙ্গে ছেলেটাকে আসতে দেখে কাঁচা থামিয়ে অবাক হয়ে চাইলেন।

অলঙ্কার ভয়ে-ভয়ে বলল, “মা, এর সব চুরি হয়ে গেছে। জঙ্গলে পড়ে ছিলেন।”

অলঙ্কারের মা অধরা উঠে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে বললেন, “এ তো বড় ঘরের ছেলে মনে হচ্ছে! যাও বাবা, দাওয়ায় গিয়ে বোসো। ওরে অলঙ্কার, চটের আসনটা পেতে দে তো!”

মায়ের এই কথাটুকুতেই অলঙ্কারের বুক আনন্দে ভেসে গেল। মাকে সে যত রাগী আর বদমেজাজি ভাবে ততটা নন তা হলে! সে তাড়াতাড়ি আসন পেতে বসতে দিল ছেলেটাকে। চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, “আপনার নাম কিন্তু বলেননি।”

“আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়।”

“ইন্দ্রদা, আমাদের বাড়িতে কিন্তু আপনার খুব অসুবিধে হবে।”

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, “অসুবিধে তোমাদেরই হবে বোধ হয়। তবে আমি এ-গাঁয়ে বেশিক্ষণ থাকব না। একটু জিরিয়ে নিয়েই চলে যাব। আগে একটু জল দাও।”

ইন্দ্র প্রায় আধঘটি জল খেয়ে নিল। অধরা দুটো বাতাসা এনে বললেন, “এ-দুটো খাও বাবা। মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে।”

বাতাসা দুটো কচমচিয়ে খেয়ে ইন্দ্র বলল, “এখন খিদেটা সহ্যের মধ্যে এসে গেছে।”

“তবে আর-একটু সহ্য করো বাবা! আমি কচুসেদ্ধ দিয়ে ভাত বসাচ্ছি। আর হিঞ্চের ঝোল। দুটি গরম ভাত খাও।”

“কিন্তু আমি যে আর বেশিক্ষণ এখানে থাকব না মাসিমা। আমাকে চলে যেতে হবে।”

অধরা করুণ চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব দুর্বল। এ-শরীরে কি হাঁটতে পারবে? দুটি খেয়ে নিলে গায়ে একটু জোর পেতে।”

ইন্দ্র সভয়ে মাথা নেড়ে বলে, “না, দেরি হয়ে যাবে। না পালালে আমার রক্ষে নেই।”

“তুমি কি ভয় পেয়েছ বাবা?”

ইন্দ্র নীরবে মাথা নেড়ে জানাল যে, সে ভয় পেয়েছে।

অধরা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময়ে বাইরে থেকে একটা ভারী গলার হাঁক শোনা গেল, “বলি ও হরিপদ, বাড়ি আছিস? হরিপদ- ও- ও ...”

অলঙ্কার শখ করে জঙ্গল থেকে একটা নতুন ধরনের ফণিমনসা এনে উঠোনের বেড়া হবে বলে লাগিয়েছিল। সেগুলো এখন বুকমান বেড়ে উঠে প্রায় নিচ্ছিদ্র এক আড়াল তৈরি করেছে। বাইরে থেকে উঠোনটা আর কারও নজরে পড়ে না। লোকটাকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু গলা শুনে অধরা আর অলঙ্কারের মুখ শুকোল।

ইন্দ্র চকিতে মুখ তুলে বলল, “লোকটা কে বলো তো!”

অলঙ্কার ম্লানমুখে বলে, “ও হচ্ছে হরিশ সামন্ত। গগন সাঁপুইয়ের খাজাঞ্চি। তাগাদায় এসেছে।”

“গগন সাঁপুই!” বলে ইন্দ্র ভু কোঁচকাল। তারপর টপ করে উঠে ঘরে ঢুকে কপাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। হরিশ সামন্ত ততক্ষণে ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পাশে শম্ভু পাইক।

অধরা ইন্দ্রর কাণ্ড নীরবে দেখলেন, কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না। হরিশের দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললেন, “উনি তো বাড়ি নেই।”

হরিশ একটু খেচিয়ে উঠে বলে, "যখনই আসি তখনই শুনি বাড়ি নেই! সাতসকালে গেল কোন চুলোয়? যাকগে সে এলে বোলো বাবু এত্তেলা দিয়েছেন। এবেলাই গিয়ে যেন একবার হুজুরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। সুদে-আসলে তার মেলা টাকা বাকি পড়েছে। বুঝলে?"

"বুঝেছি। এলে বলব' খন। "

"আর-একটা কথা। মন দিয়ে শোনো। আজ আদায় উশুলের জন্য আসা নয়। বাবুর একটা জরুরি কাজ করে দিতে হবে। ভয় খেয়ে যেন আবার গা-ঢাকা না দেয়। বরং কাজটা করে দিলে কিছু পেয়েও যাবে। বুঝলে?"

"বুঝেছি।"

হরিশ সামন্ত চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র বেরিয়ে এল। তার মুখে-চোখে আতঙ্কের গভীর ছাপ। সে অলঙ্কারকে জিজ্ঞেস করল, "কী কাজের জন্য তোমার বাবাকে খুঁজছে ওরা?"

ঠোঁট উলটে অলঙ্কার বলে, "কে জানে! তবে বাবার তো সোনার দোকান ছিল, গয়না বানাতেন। এখন আর ব্যবসা ভাল চলে না। গগনজ্যাঠা মাঝে-মাঝে সোনা গলানোর জন্য বাবাকে ডাকেন।"

ইন্দ্রর মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যেন সরে গেল। সাদা ফ্যাকাসে মুখে সে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল শুন্য দৃষ্টিতে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "গলিয়ে ফেলবে! গলিয়ে ফেলবে!"

অধরা একদৃষ্টে দেখছিলেন ইন্দ্রকে। হঠাৎ একটু হেসে বললেন, "শোনো বাবা ইন্দ্র, তুমি অত ভয় পেয়ো না। ওপাশে একটা পুকুর আছে। ভাল করে স্নান করে এসো তো। তারপর খেয়ে একটু ঘুমোও। তোমার কোনও ভয় নেই। মাথা ঠাণ্ডা না করলে মাথায় বুদ্ধি আসবে কেমন করে?"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু ওরা যে আমার সব মোহর গলিয়ে ফেলবে!"

অধরা অবাক হয়ে বলেন, "তোমার মোহর? মোহর তুমি কোথায় পেলে বাবা? আর তা গগনবাবুর কাছেই বা গেল কী করে?"

"সে কথা বলতে অনেক সময় লাগবে।"

"তবে এখন থাক। আগে স্নান-খাওয়া হোক। তারপর কথা।"

"কিন্তু ততক্ষণে..."

অধরা মাথা নেড়ে বললেন, "ভয় নেই। সোনা যাতে না গলে তার ব্যবস্থা হবে। এ-গাঁয়ে স্বর্ণকার মাত্র একজন, সে ওই অলঙ্কারের বাবা। তিনি না গেলে ও সোনা গলবে না।"

ইন্দ্র বেজার মুখে খানিকক্ষণ বসে রইল। অলঙ্কারই তাকে ঠেলে তুলে পুকুর থেকে স্নান করিয়ে আনল। দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে ভাল করে ভাত খেতে পারল না সে। বোধ হয় এসব সামান্য খাবার খাওয়ার অভ্যাসও নেই।

দুপুরে হরিপদ ফিরে ঘরে অতিথি দেখে অবাক। তবে অলঙ্কার যা ভয় করছিল তা কিন্তু হল না। হরিপদ রেগেও গেলেন না, বিরক্তও হলেন না। আবার যে খুশি হলেন, তাও নয়। অধরা বললেন, "ও ছেলেটি সম্পর্কে সব বুঝিয়ে বলছি। তুমি আগে স্নান-খাওয়া করে নাও।"

হরিপদর স্নান-খাওয়া সারা হলে চারজন গোল হয়ে বসল। ইন্দ্র খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করল, "আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়। আমি খুব শিশুকালে আমার মা বাবার সঙ্গে বিদেশে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি লন্ডনের এক মস্ত লাইব্রেরিতে চাকরি করি। আমার কাজ হল পুরনো পুঁথিপত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর মাইক্রোফিল্ম তুলে রাখা। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নানা ভাষার পুঁথি,দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্র আমাদের লাইব্রেরি সংগ্রহ করে রাখে। তার মধ্যে বাংলাভাষার পুঁথিও অনেক আছে। একদিন হঠাৎ

একটি পুঁথির মাইক্রোফিল্ম করতে গিয়ে আমি একটা মজার জিনিস লক্ষ করি। পুঁথিটা পদ্যে লেখা এক দিশি বাঙালি রাজার জীবনী। মজার জিনিস হচ্ছে রাজার গুণাবলী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি সব বিবরণ। রাজা নাকি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি নাকি সশরীরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অনায়াসে যাতায়াত করে থাকেন। তাঁর নাকি পক্ষিরাজ ঘোড়া এবং পুষ্পক রথও আছে। তাঁর ওপর মা লক্ষ্মীর নাকি এমনই দয়া যে, রোজ নিশুতরাতে একটা প্যাচা নাকি আকাশ থেকে উড়ে এসে রাজবাড়ির ছাদে একটি করে সোনার টাকা ফেলে যেত, রাজা ভোরবেলা ছাদে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনতেন। বোধ হয় রাজার কোনও চাটুকার সভাসদ জীবনীটা লেখেন। লেখকের নাম চন্দ্রকুমার। আর রাজার নাম মহেন্দ্রপ্রতাপ। আপনারা কি শুনেছেন এঁর নাম? প্রায় দেড়শো বছর আগে শিমুলগড়ের দক্ষিণে রায়দিঘিতে তাঁর রাজত্ব ছিল।”

হরিপদ সচকিত হয়ে বলেন, “শুনব না কেন? বাপ-পিতামহের কাছে ঢের শুনেছি। ওই সোনার টাকার কথাও এ-অঞ্চলের সবাই জানে। তবে রাজাগজার গল্পে অনেক জল মেশানো থাকে। কেউ বিশ্বাস করে; আবার কেউ করে না।”

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, “ঠিকই বলেছেন। আমিও তাই পুঁথিটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। তবে পুঁথির শেষদিকে কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের ছড়া ছিল। অনেকটা ধাঁধার মতো। আমার মনে হল, সেগুলো কোনও সঙ্কেতবাক্য। পুরনো পুঁথিপত্র থেকে সঙ্কেতবাক্য উদ্ধার করার একটা নেশা আমার আছে। সেই ছড়াগুলো নাড়াচাড়া করে বুঝলাম, চন্দ্রকুমার চাটুকার হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এবং ভাষার ওপর তাঁর দখলও চমৎকার। আমি দু দিন-দু রাত্তির ধরে সেইসব ছড়ার অর্থ উদ্ধার করে দেখলাম, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের আসল চরিত্র কীরকম সেসব কথা চন্দ্রকুমার খুব সাবধানে প্রকাশ করেছেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা, ইংরেজের খয়ের খাঁ, প্রজারা তাঁকে মোটেই পছন্দ করে না। রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতিরও ছিলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রপিতামহ প্রাসাদের নীচে শ’খানেক গুপ্ত প্রকোষ্ঠ তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। এই প্রকোষ্ঠগুলো আসলে ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা। রাজ্য আক্রান্ত হলে লুকিয়ে থাকার জন্য এবং মূল্যবান ধনসম্পত্তি নিরাপদে

রাখার জন্যই সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল। সে নাকি এমন গোলকধাঁধা যে, একবার সেখানে ঢুকলে বেরিয়ে আসা ছিল সাঙ্ঘাতিক কঠিন। সেই পাতালপুরী কতটা নিরাপদ তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপ নাকি মাঝেমধ্যে এক-আধজন দাস বা দাসীকে সেখানে নামিয়ে দিতেন। তাদের কেউই শেষ অবধি বেরিয়ে আসতে পারত না। মাটির নীচে বেভুল ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খিদে-তেষ্টায় মরে পড়ে থাকত। সেইসব মৃতদেহ উদ্ধার বা সৎকার করা হত না। সেইসব দাস-দাসীর প্রেতাত্মারা যখ হয়ে গুপ্তধন পাহারা দিত। পুঁথির শেষে গুপ্তধনের হদিসও চন্দ্রকুমার দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অত্যন্ত কৃপণ, কুটিল, বায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহপ্রবণ। রাজার নির্দেশেই চন্দ্রকুমার গুপ্তধনের নির্দেশ লিখে রাখছেন বটে, কিন্তু তাঁর একটা ভয় হচ্ছে। ভয় হল, রাজা যদি গুপ্তধনের সঠিক নির্দেশই চন্দ্রকুমারকে দিয়ে থাকেন, তা হলে খবরটা যাতে গোপন থাকে তার জন্য তিনি চন্দ্রকুমারকে অবশ্যই হত্যা করবেন। আর যদি ইচ্ছে করেই ভুল নির্দেশ দিয়ে থাকেন তা হলে চন্দ্রকুমার বেঁচে যাবেন। চন্দ্রকুমারের বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মোহর জমানোর নেশা ছিল। পৃথিবীর নানা জায়গার মোহর তিনি সংগ্রহ করতেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য মোহরও তার মধ্যে ছিল। সেইসব ঐতিহাসিক মোহরের দাম শুধু সোনার দামে নয়।

ঐতিহাসিক মূল্য ধরলে এক-একটার দামই লাখ-লাখ টাকা। যদি কোনও বোকা লোকের হাতে সেগুলো যায় তবে সে আহাম্মকের মতো তা সোনার দরে ছেড়ে দেবে বা গলিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন। সেই ভয়ে আমি পুঁথিটার শেষ অংশটা কপি করে নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো করে ভারতবর্ষে চলে আসি। এদেশ সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা নেই।”

হরিপদ, অধরা আর অলঙ্কার সম্মোহিত হয়ে শুনছিল। হঠাৎ হরিপদ একটু গলাখাকারি দিয়ে বললেন, “শুনেছি আমাদের বংশের কে একজন যেন মহেন্দ্রপ্রতাপের দরবারে স্বর্ণকারের কাজ করতেন। নামটা বোধ হয় নকুড়।”

ইন্দ্র একটু অবাক হয়ে বলে, “হ্যাঁ, নকুড় কর্মকার মোহরের ব্যাপারে খুব জানবুঝদার লোক ছিলেন। বণিক বা দালালরা যেসব মোহর নিয়ে আসত তা নকুড় কর্মকার পরীক্ষা করে দেখে কিনতে বললেই রাজা কিনতেন।”

অলঙ্কার একটু ধৈর্য হারিয়ে বলল, “তারপর ইন্দ্রদা?”

ইন্দ্রর চেহারাটা এখন আর তেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে না। পেটের কথা খোলসা করে বলতে পেরে তার মুখে একটা রক্তাভা এসেছে। সে একটু চিন্তা করে বলল, “লন্ডন থেকে রওনা হওয়ার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা আপাতত উহ্য থাক। কিন্তু এদেশে পা দিয়েই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। আমি শুনেছি এদেশের সরকার খুব ঢিলাঢালা, কোনও কাজেই তাদের গা নেই। তাই আমি গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের অনুমতি চাইনি। এসব ব্যাপারে এদেশে বেসরকারি উদ্যোগেই কাজ চটপট হয়। আমি আমার পোর্টেবল তাঁবু আর যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম লন্ডন থেকেই। দু-একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে। একগাদা ফড়ে আর দালাল পেছনে লাগল। যাই হোক, কোনওরকমে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি একাই শেষ অবধি রায়দিঘিতে হাজির হই। কিন্তু কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার একটু পরেই আমার মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে। সারাক্ষণ নজর রাখছে আমাকে। খুব অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করি। রায়দিঘিতে এসে দেখি, রাজপ্রাসাদ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা জংলা জায়গা। সাপখোপের বাসা। মাঝখানে একটা ধ্বংসস্তূপ। কাছেপিঠে লোকালয় বলতে এই শিমুলগড়, তা সেটাও দেড় মাইল দূরে। আমি খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ক্যাম্প খাঁটিয়ে আমার কাজ শুরু করলাম। প্রথম, জায়গাটা মাপজোখ করা এবং নিশানা ঠিক করা। প্রাসাদের যা অবস্থা তাতে মাটির নীচের সব প্রকোষ্ঠই ভেঙে ধসে গেছে। সুতরাং ভুলভুলাইয়ার পথ ধরে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু চন্দ্রকুমারের বিবরণে সেই পথের কথাই আছে। ফলে আমার কাজ বহুগুণ বেড়ে গেল। চন্দ্রকুমার একটা জয়স্তম্ভের কথা বলেছেন। তার নীচের প্রকোষ্ঠেই মোহর থাকার কথা। কিন্তু জয়স্তম্ভ যে কোথায় ছিল তা কে জানে। সারাদিন

মাপজোখ আর খোঁড়াখুঁড়িতে অমানুষিক পরিশ্রম যাচ্ছে। তার চেয়েও ভয়ের কথা, চন্দ্রকুমারকে যদি রাজা ইচ্ছে করেই ভুল নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা হলে আমার গোটা পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হবে। জল এবং খাবারের বেশ অভাব হচ্ছিল। কাজ করতে করতে খাওয়ার কথা মনেও থাকত না। অনিয়মে এবং এদেশের জলে আমার পেট খারাপ হল, শরীর ভেঙে যেতে লাগল। আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। যে কথাটা এতক্ষণ বলিনি সেটা হল, রায়দিঘিতে ক্যাম্পে থাকার সময় আমার কিন্তু সারাক্ষণই মনে হত, আমি ঠিক একা নই। কেউ যেন আড়াল থেকে আমার ওপর নজর রাখছে। রাত্রিবেলা আমি তাঁবুর আশেপাশে পায়ের শব্দ পেতাম যেন। উঠে টর্চ জ্বেলে, কাউকে দেখতে পেতাম না! যখন অসুস্থ হয়ে পড়লাম তখন একদিন জ্বরের ঘোরের মধ্যে শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, নিমগাছে যে গুলঞ্চ হয়ে আছে সেটা চিবিয়ে খেলে সেরে যাবে।

"আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সত্যিই নিম-গুলঞ্চ খেয়ে শরীর অনেকটা সুস্থ হল। তারপর আরও দু'দিন দু'রকম পাতার নাম শুনলাম, কুলেখাড়া আর থানকুনি। কোথায় আছে তাও বলে দিল। খেয়ে আরও একটু উপকার হল। কিন্তু, কথা হল, লোকটা কে? তার মতলবটাই বা কী। একদিন নিশুতরাতে তার আগমন টের পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে? জবাবে সে বলল, "আমি ছায়াময়।"

অলঙ্কার অবাক হয়ে বলে, "ছায়াময়? আরে, আজ সকালে তো ছায়াময়ই আমাকে বলল, বাঁশঝাড়ের পেছনের জঙ্গলে একটা জিনিস পাবে! আমি গিয়ে আপনাকে দেখতে পেলাম।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলে, "তা হলে বলতেই হবে, সে যদি মানুষ হয়, তবে খুব মহৎ মানুষ, আর যদি ভূত হয়, তবে খুব উপকারী ভূত।"

"তারপর বলুন।"

"দিন কুড়ি দিনরাত খেটে অবশেষে বিজয়স্তম্ভের একটা আভাস পেলাম। পাওয়ার ড্রিল দিয়ে গর্ত করে ভেতরে আলো ফেলে গর্ভগৃহ পাওয়া গেল। সেখানে ধুলোময়লা, রাবিশের স্তূপ। কোনওরকমে ফোকটা বড় করে নীচে নেমে বিস্তর ময়লা সরিয়ে তবে পেতলের কলসিটা পাওয়া গেল। মোহর সমেত।"

অধরা কথার মাঝখানে বলে ওঠেন, "বাবা ইন্দ্র তোমার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে নাও।"

জল খেয়ে ইন্দ্র বলল, "অনেক মেহনত করে বিকেলে সেই কলসিটা ওপরে তুলে আনলাম। তাঁবুতে এনে মোহর বের করে দেখলাম, সত্যিই অমূল্য সব মোহর। পাঁচ-সাতটা তো খুবই দুষ্প্রাপ্য। মোহরগুলো দেখে আমি এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম যে, চারদিকে চাইবার মতো অবস্থাও নয়। এক-এক করে গুনে দেখলাম মোট দুশো এগারোখানা আছে। আমার হিসাবে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ। গুনে যখন শেষ। করেছি, তখন হঠাৎ তাঁবুর দরজা থেকে একটা মোলায়েম গলা বলে উঠল, "হ্যাঁ, দুশো এগারোখানাই আছে।' চমকে তাকিয়ে দেখি, শূল হাতে দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক বিশাল মূর্তি। চোখ দুখানা জুলজুল করছে, মুখে একখানা বাঁকা হাসি। পরনে টকটকে লাল রঙের একটা পোশাক। তাকে দেখে প্রথমটায় ভীষণ চমকে গেলেও টপ করে সামলেও নিলাম। তা হলে এই লোকটাই ছায়াময়! এইই আড়াল থেকে আমার গতিবিধি নজরে রাখছিল এবং আমার কিছু উপকারও করেছে। কিন্তু আসল সময়ে ঠিক এসে হাজির হয়েছে সশরীরে! আমি যখন মোহরগুলো একটা চামড়ার ব্যাগে পুরছিলাম, লোকটা হাত বাড়িয়ে বলল, "দিয়ে দে, দিয়ে দে, ও মায়ের জিনিস, মায়ের কাছেই থাকবে। তুই কেন পাপের ভাগি হতে যাস? লোকটা যে জালি তাতে সন্দেহ নেই। আমি হঠাৎ উঠে লোকটাকে একটা ঘুসি মারলাম। বিদেশে আমি বকসিং-টসিং করেছি বটে, কিন্তু এখন না খেয়ে অসুখে ভুগে আমার শরীর খুব দুর্বল। কিন্তু এদেশের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য ও সহ্যশক্তি এতই খারাপ যে, আমার সেই দুর্বল ঘুসিতেই লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত

দেরি না করে ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি, একটু দূরে আরও একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় কাপালিকের চেলা।

সে আমাকে দেখে তেড়ে এল। আমি বিপদ বুঝে জঙ্গলে ঢুকে গা-ঢাকা দিলাম। একটু অন্ধকার হতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে শিমুলগড় পৌঁছই। গায়ে তখন একরত্তি শক্তি নেই, খিদেয়-তেষ্টায় ভেতরটা কাঠ হয়ে আছে। কারও বাড়িতে আশ্রয় চাইতে আমার সাহস হল না। কে কেমন লোক কে জানে! অত মোহর নিয়ে কোনও বিপদের মধ্যে পা বাড়ানো ঠিক নয়। আমি একটা আমবাগানে ঢুকে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা আমার কর্তব্য ভেবে দেখব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু কপাল খারাপ। যখন একটা গাছতলায় বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, তখনই কয়েকটা কুকুর তেড়ে এল। অগত্যা গাছে উঠলাম। পাশেই একটা বাড়ি। গাছের একটা মোটা ডাল বাড়ির দেওয়ালের ওপাশে ঝুঁকে পড়েছে, ভেতরে একটা খড়ের গাদা। ভাবলাম যদি খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়তে পারি, তা হলে আরামে রাতটা কাটানো যাবে। কিন্তু যেদিন ভাগ্য মন্দ হয় সেদিন সব ব্যাপারেই বাধা আসে। খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামতেই কুকুর আর দরোয়ানের তাড়া খেয়ে একটা ঘরে ঢুকলাম। একদম ইঁদুরকলে ধরা পড়ে যেতে হল। মোহর গেল, মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আর কিছু মনে নেই। সকালে অলঙ্কার গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে।”

হরিপদ মাথা নেড়ে বলেন, “তা হলে এই হল ব্যাপার! গগন সাঁপুই যা রটাচ্ছে তা যে সত্যি নয়, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। চোর নাকি তার যথাসর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল। ওবাড়িতে চোরের চৌদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই যে সেঁধোয়। কুকুর, দরোয়ান, তিনটে জোয়ান ছেলে, লোকলস্কর তো আছেই, তার ওপর তার দরজা-জানলা সব কেল্লার মতো মজবুত, এই পুরু ইস্পাতের সিন্দুক। এ-তল্লাটের কোনও চোর ও বাড়িতে নাক গলাবে না। আর আমার যখন ডাক পড়েছে তখন সন্দেহ নেই গগন বাটপাড়ি করা সোনা তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলতে চাইছে।”

ইন্দ্র ফ্যাকাসে মুখে বলে, “তা হলে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। যেমন করেই হোক ওই মোহর রক্ষা করা দরকার। পৃথিবীর বহু মিউজিয়াম এবং সংগ্রহশালা ওসব মোহর লুফে নেবে।”

অলঙ্কার বলল, “আচ্ছা, পুলিশে জানালে কেমন হয়?”

ইন্দ্র ম্লানমুখে বলে, “আমি সরকারি অনুমতি ছাড়াই খোঁড়াখুঁড়ি করেছি, তাই আইন বোধ হয় আমার পক্ষে নেই।”

হরিপদও মাথা নেড়ে বলে, “তা ছাড়া পুলিশের সঙ্গেও গগনের সাঁট আছে। মোহরও এতক্ষণে গোপন জায়গায় হাপিস হয়ে গেছে। পুলিশ ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারবে না।”

ইন্দ্র করুণ স্বরে বলে, “তা হলে?”

হরিপদ উঠে গায়ে জামা চড়াতে-চড়াতে বলে, “আমি গগনের বাড়ি যাচ্ছি। একমাত্র আমাকেই সে মোহরগুলো বার করে দেখাবে। চোরাই মোহর যত তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলা যায় ততই তার পক্ষে নিরাপদ। তবে তুমি ভেবো না ইন্দ্র। মোহর যাতে না গলানো হয় সে-চেষ্টা আমি করব। আর-একটা কথা, তোমাকে কিন্তু একটু গা-ঢাকা দিয়েই থাকতে হবে। গাঁয়ের পাঁচজন যেন দেখতে না পায়। দেখলে একটা শোরগোল হবে। আর গগনের কানে গেলে সে হয়তো তার দুই ভাড়াটে খুনে কালু আর পীতাম্বরকে লেলিয়ে দেবে।”

“তারা কারা?”

“তারা এ-গাঁয়ের লোক নয়। নিকুঞ্জপুরে থাকে। সেখানে গিয়েই গোপন খবরটা পেলুম। এরা পয়সা পেলে নানা কুকর্ম করে দেয়। আগে গগন কখনও তাদের ডাকেনি। আজই হঠাৎ শুনলুম, কালু আর পীতাম্বরকে নাকি ডাকিয়ে এনেছে গগন। কেন কে জানে! তবে

তুমি সশরীরে এ-গাঁয়ে আছ জানলে গগন আর ঝুঁকি নেবে না। তার ওপর গাঁয়ের লোকের কাছে তুমি চোর বলে প্রতিপন্ন হয়েই আছ। তোমার এখন চারদিকে বিপদ।"

"তাই দেখছি।" বলে ইন্দ্র বিষণ্ন মুখে বসে রইল। তারপর শুকনো মুখে বলল, "নিজের বিপদ নিয়ে আমি তো ভাবছি না। মোহরগুলো নষ্ট না হলেই হল।"

হরিপদ একটু হেসে বলে, "ও-মোহরের ওপর আমারও একটু দরদ আছে হে। নকুড় কর্মকারের নামটা যখন জড়িয়ে আছে তখন ওবস্তু নিয়ে হেলাফেলা করার উপায় আমার নেই। তবে কতটা কী করতে পারব তা ভগবান জানেন।"

ইন্দ্র বলে, "মোহরগুলো যে গগনের নয়, ওটা যে আমি রায়দিঘি রাজবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছি, তার কিন্তু একজন সাক্ষী আছে। সে ওই কাপালিক।"

হরিপদ একটু হেসে বলে, "সেও মহা ধুরন্ধর লোক। তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দুটো টাকা হাতে দিয়ে যদি তাকে বলতে বলো যে, সূর্য পশ্চিমদিকে ওঠে, তো সে তাই বলবে। ওসব লোকের কথার কোনও দাম নেই।"

"তবু আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে।"

হরিপদ বেরিয়ে যাওয়ার পর অধরা বলল, "দুপুরে তো কিছুই খাওনি বাবা। ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করেছ। একটু সাগু ভিজিয়ে রেখেছি, গাছের পাকা মর্তমান কলা আর মধু দিয়ে খাবে?"

ইন্দ্র একটু হেসে বলল, "দিন।"

সাগুর ফলার তার খুব খারাপ লাগল না।

খাওয়াদাওয়ার পর ইন্দ্র অলঙ্কারকে বলল, "আমাকে একটা ছদ্মবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারো? একটু বেরনো দরকার। হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব।"

অলঙ্কার একটু ভেবে বলে, "আপনি তো বাবার একটা লুঙ্গি পরে আছেন। গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে নিলে চাষিবাসির মতো লাগবে। তবে আপনার রংটা তো ফরসা, একটু ভুষো কালি মেখে নিলে হয়ে যাবে।"

"মন্দ বলোনি। সহজ-সরল ছদ্মবেশই ভাল। নকল দাড়ি-গোঁফ লাগালে লোকের সন্দেহ হতে পারে।"

মতলব শুনে অধরা প্রথমটায় বারণ করলেও পরে বললেন, "তা হলে অলঙ্কারকেও সঙ্গে নাও বাবা। ও তো গাঁ চেনে। বিপদ হলে খবরটা দিতে পারবে।"

৪. গগন সাঁপুইয়ের বাড়ির পেছন দিকে

গগন সাঁপুইয়ের বাড়ির পেছন দিকে ঢেঁকিঘরের দাওয়ায় দুটি লোক উবু হয়ে বসা। দুজনেরই বেশ মজবুত কালো চেহারা। গগন সামনেই দাঁড়িয়ে। বসা লোক দুটোর একজন কালু, অন্যজন পীতাম্বর। কালু কথাটথা বেশি বলে না। ভ্যাজর ভ্যাজর করা তার আসে না। সে হল কাজের লোক। তবে পীতাম্বর বেশ বলিয়ে কইয়ে মানুষ। পীতাম্বরের সঙ্গে গগনের একটু দরাদরি হচ্ছিল।

পীতাম্বর বলল, "রেটটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে গগনবাবু? বাজারের অবস্থা তো দেখছেন! কোন জিনিসটার দর এক জায়গায় পড়ে আছে বলতে পারেন? চাল, ডাল, নুন, তেল, আটা-ময়দা, জামা কাপড় সব কিছুর দুরই তো ঠেলে উঠছে! আমরাই বা তা হলে পুরনো রেটে কী করে কাজ করি বলুন?"

গগন একগাল হেসে বলে, "ওরে বাবা, এ তো আর খুনখারাপি নয় যে, দেড়শো টাকা হাঁকছিস। একটা পাজি লোককে একটু শুধু কড়কে দেওয়া, আর আলতো হাতে দু-চারটে চড়-চাপড় মারা। ধরলাম না হয়, মুখে যেসব বাক্যি বলবি তার জন্য পাঁচটা টাকাই নিলি। আর চড়চাপড় ধর, টাকায় একটা করে। কিছু কম রেট হল? ধর, যদি দশটা চড়ই কষাস তা হলে হল দশ টাকা, আর বকাঝকা চোখ রাঙানোর জন্য পাঁচ টাকা। তার ওপর না হয় আরও পাঁচটা টাকাই বখশিস বলে দিচ্ছি। একুনে কুড়ি টাকা।"

পীতাম্বর হা-হা করে হেসে বলে, "এ তো সেই সত্যযুগের রেট বলছেন কতা। টাকায় একটা চড় কি পোষায় বলুন! আর ধমক-চমক তো এমন হওয়া চাই, যাতে লোকটার পিলে চমকে যায়। তা সেরকম ধমক-চমক চোখ রাঙানোর জন্য দরটাও একটু বেশি দিতে হবে বইকী! তার ওপর লোকটা আবার কাপালিক, মারণ-উচাটন জানে, বাণ-টান মারতে পারে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি মশাই, অত অল্প রেটে কাজ করতে গিয়ে কাপালিককে চটাতে পারব না।"

গগন শশব্যস্তে বলে, “ওরে না না। সে মোটে কাপালিকই নয়। এক নম্বরের ভণ্ড। এইটুকু বয়স থেকে চিনি। মারণ-উচাটন জানলে কবে এ-গাঁ শ্মশান করে ছেড়ে দিত। এসব নয় রে বাবা। তবে লোকটা পাজি। আমি বাবা নিরীহ মানুষ, তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। সে আমার গোরুর দুধ চায়, তার মায়ের বানে মন্দির তুলে দিতে বলে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চিরকালই হয়ে আসছে, নতুন কথা কী? শোষণ, উৎপীড়ন, নির্যাতন–এসব আর কতদিন সহ্য করা যায় বল তো! দে বাবা, একটা অসহায় লোককে একটা শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দে। ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন। কুড়ি না হয়, ওই পঁচিশই দেব। দশটা চড়ের দরকার নেই, গোটা দুই কম দিলেও হবে। তবে দাঁত কড়মড় করে চোখ পাকিয়ে হুমকিটা ভালরকম দেওয়া চাই। ওই সেবার ভট্ট কোম্পানির ‘রাবণবধে রাবণ যেমনধারা হনুমানকে দেখে করেছিল। দেখিসনি বুঝি? সে একেবারে রক্তজল করা জিনিস।”

পীতাম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলে, “ভাল জিনিসের জন্য একটু উপুড়হস্ত হতে হয় মশাই। কাঁচাখেগো কাপালিকের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছেন, চড়চাপড় চাইছেন, রাবণের পার্ট চাইছেন, মাত্র পঁচিশটি টাকায় কি এত হয় কত? :! এর ওপর কর্মফলের জন্য যে ভোগান্তি আছে, তার দামটা কে দেবে মশাই? আপনারা তো মশাই দু-পাঁচশো টাকা ফেলে দিয়ে হুকুম জারি করেই খালাস, ওমুকের লাশ ফেলে দিয়ে আয়, তমুকের ঘরে আগুন দিয়ে দে, ওমুকের খেতের ধান লোপাট কর, তমুকের মরাই ফাঁক করে দিয়ে আয়। ইদিকে এসব করতে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতায় তো আর আমাদের নামে ভাল-ভাল সব কথা লেখা হচ্ছে না। সেখানেও তো নামের পাশে ঘনঘন ঢ্যারা পড়ছে। এসব অপকর্মের জন্য নরকবাসের মেয়াদও তো বাড়ছেই মশাই! কুম্ভীপাকে শুনেছি, হাঁড়িতে ভরে সেদ্ধ করে, বিষ্ঠার চৌবাচ্চায় ফেলে রাখে বছরের পর বছর, কাঁটাওলা বেত দিয়ে পেটায়। তা মশাই সেসব ব্যাপারের জন্য দামটা কে দেবে? পাপ-তাপ কাটাতে আমাদের যে মাসে একবার করে কালীঘাট যেতে হয়, তারকেশ্বরে হত্যে দিতে হয়, তার খরচটাই বা উঠছে কোত্থেকে? কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণেও গিয়ে একবার মাথা মুড়িয়ে

আসতে হবে, তা তারও রাহাখরচা আছে। আপনারা তো কাজ বাগিয়ে খালাস, এখন মরতে মরুক কেলো আর পীতাম্বর। না কতা, অত শস্তায় হচ্ছে না। আমাদের পরকালটার কথাও একটু ভাববেন।"

গগন ভারী অমায়িক গলায় বলে, "ওরে বাবা, ভগবান কি আর কানা নাকি? বলি হ্যাঁ বাবা পীতাম্বর, একটা পাজি লোককে টিট করলেও কি পাপ হয়? তা হলে বলছ যে, রাবণকে মেরে রামচন্দ্রেরও পাপ হয়েছিল? না কি দুর্যোধনকে মেরে ভীমের? পাজি বদমাশদের ঠাণ্ডা করলে ভগবান খুশি হয়ে তোদের আর পাঁচটা পাপই হয়তো কেটেকুটে দিলেন খাতা থেকে। তা ছাড়া দুর্বলকে রক্ষা করা তো মহাপুণ্যের কাজ। বিনি মাগনা করে দিলে তো খুবই ভাল, তাতে যদি না পোয় তা হলে একটা ন্যায্য দরই নে। আমার দিকটাও একটু ভেবে বল বাবা, যাতে তোরও পুণ্যি হয়, আমার ট্যাকটাও বাঁচে।"

পীতাম্বর একটু গুম হয়ে থেকে বলে, "ওই চড়পিছু চারটে করে টাকা ফেলে দেবেন, আর চোখ রাঙানোর জন্য কুড়িটি টাকা। এর নীচে আর হচ্ছে না। আর চড়চাপড় অত হিসাব করে দেওয়া যায় না, দু-চারটে এদিক-ওদিক হতে পারে। ধরুন দুই চড়েই যদি কাজ হয়ে যায় তা হলে আট চড়ের কোনও দরকার নেই। আবার আটে কাজ না হলে দশ বারোটাও চালাতে হতে পারে। তা কম-বেশি আমরা ধরছি না। ওই আট চড়ের বাবদ বত্রিশটা টাকা ধরে দেবেন। যদি রাজি থাকেন তো চিড়ে-দই আনতে বলুন, আমাদের তাড়া আছে। সেই আবার গঙ্গানগরে এক বাড়িতে আগুন দিতে হবে আজ রাতেই। আপনার কাজটা সেরেই গঙ্গানগর রওনা হতে হবে। অনেকটা পথ।"

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, "চিড়ে-দইয়ের কথা কী বললি বাপ? ঠিক যেন বুঝতে পারলুম না।"

পীতাম্বর আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "কাজ হাতে নিলে আমরা মক্কেলের পয়সায় একটু ফলার করি। ওইটেই রীতি। এর মানে হল, কাজটা আমরা হাতে নিচ্ছি। দুজনের

জন্য দু ধামা চিড়ে, দু ডেলা গুড়, সেরটাক দই, আর চারটি পাকা কলা। আর মায়ের পুজোর জন্য পাঁচ সিকে করে দুজনের মোট আড়াই টাকা।

"বাপ রে! তোদের আম্বা বড় কম নয় দেখছি।"

আপনি মশাই এত কেপ্পন কেন বলুন তো! সেই নিকুঞ্জপুর থেকে টেনে এনে তো ছুঁচো মেরে আমাদের হাত গন্ধ করাচ্ছেন। খুনখারাপি, আগুন দেওয়া-টেওয়া বড় কাজ নয়। এইসব কম টাকার কাজ আজকাল আর আমরা করি না। তার ওপর যা দরাদরি লাগিয়েছেন, এ তো পোষাচ্ছে না মশাই।"

"রাগ করিসনি বাপ। চিড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। পাইক বরকন্দাজ তো আমারও আছে, কিন্তু তারা সব পেঁয়ো যোগী। কালী কাপালিক তাদের মোটেই ভয় খায় না। উলটে চোটপাট করে। কাজটা কিন্তু ভাল করে করা চাই। যেন আর কখনও রা কাড়তে না পারে। মুখ একেবারে বন্ধ করে দিবি।"

গগন হাঁকডাক করে চিড়ে-দই সব আনিয়ে ফেলল। কালু আর পীতাম্বর যখন ফলারে বসেছে তখন কাজের লোক কেষ্ট এসে খবর দিল, হরিপদ কর্মকার এসেছে। গগন শশব্যস্তে বাইরে বেরিয়ে এল।

একগাল হেসে গগন বলল, "এসেছিস ভাই হরিপদ! আয়, বিপদের দিনে তুই ছাড়া আর আমার কে আছে বল? ভেতরে চল ভাই, একটু গোপন শলাপরামর্শ আছে।"

হরিপদকে ঘরে ঢুকিয়ে খিল এটে গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "বিপদ যখন আসে তখন চতুর্দিক থেকেই আসে। শুনেছিস তো, কাল রাতে এক সাঙ্ঘাতিক চোর ঢুকেছিল বাড়িতে! সে কী চোর রে বাবা, এইটুকুন বয়স, কিন্তু তার বুদ্ধি আর কেরামতির বলিহারি যাই। দু-দুটো বাঘা কুকুর, পাইক, বাড়িসন্ধু এত লোকজন, মজবুত দরজা-জানলা কিছুই তাকে রুখতে পারেনি। ঘরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েই গিয়েছিল প্রায়। মা মঙ্গলচণ্ডীই রক্ষা করেছেন। এ কী দিনকাল পড়ল রে হরিপদ? এ যে বাংলার

ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা! কলিযুগের শেষদিকটায় নাকি চোর বাটপাড়দের খুব বাড়বাড়ন্ত হবে। তাই হচ্ছে দেখছি। ওদিকে বিজ্ঞানের যা অগ্রগতি হচ্ছে শুনতে পাই সেটাও ভয়েরই ব্যাপার। বিজ্ঞানের কলকাঠি সব চোরদের হাতেই চলে যাচ্ছে বুঝি! নইলে এত লোককে ঘুম পাড়িয়ে নিঃসাড়ে কাজটা যে কী করে সেরে ফেলল, সেইটেই ভেবে পাচ্ছি না। তাই ভাবছি সোনাদানা আর ঘরে রাখা ঠিক নয়। মুকুন্দপুরের বিশু হাজরার চালকলটা কিনব-কিনব করছিলাম, বায়নাপত্তরও হয়ে আছে। বিশু হাজরাও চাপ দিচ্ছে খুব। তাই ভাবছি, আর দেরি নয়, ঘরের সোনার ওপর যখন চোর-ছ্যাচড়ের নজর পড়েছে, তখন ও-জিনিস না রাখাই ভাল। ধানকল তো আর চোরে নিতে পারবে না, কী বলিস?”

হরিপদ কাঁচুমাচু মুখে বলে, “আজ্ঞে, তা তো বটেই।”

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “নেইও বেশি কিছু। ঠাকুরদার আমলের গোটাকয় মোহর। স্মৃতিচিহ্নই একরকম। কতকালের

জিনিস। গঞ্জের শাবলরাম মাড়োয়ারির সঙ্গে কথাও হয়েছে। তবে সে সেয়ানা লোক। বলে কিনা, পুরনো আমলের মোহরে নাকি মেলা ধুলোময়লা ঢুকে থাকত। সত্যি নাকি রে?”

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, “আজ্ঞে, অতি সত্যি কথা। সে আমলে সোনার শোধনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না তো।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গগন বলে, “মাড়োয়ারিও তাই বলছে রে। সে বলেছে, মোহর গলিয়ে শোধন করে খাঁটি সোনার বাট দিলে সে নগদ টাকায় কিনে নেবে। তুই ভাই, চটপট কাজটা করে দে। মাড়োয়ারির পো কাল বাদে পরশুই নাকি দেশে চলে যাবে। তার মেয়ের বিয়ে। সোনাদানার তারও বড় দরকার। তোর জিনিসপত্তর আজই নিয়ে চলে আয়। কোণের ঘরে বসে কাজ করবি।”

হরিপদ একটু উদাস মুখে বলে, “আগে মোহরগুলো তো দেখি।” গগন তার লোহার আলমারি খুলে চমৎকার চামড়ার ব্যাগখানা বার করল। একটু দুঃখী মুখে বলল, “তুই ছাড়া বিশ্বাসী লোকই বা আর পাব কোথায়। কাজটা করে দে, থোক পঞ্চাশটা টাকা দেব’খন। তবে আজ রাতেই কাজ সেরে ফেলা চাই।”

গগন হরিপদর হাতে কয়েকখানা মোহর দিতে সে সেগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। বিকেলের আলো মরে এসেছে। গগনের ঘরে জানলা-দরজাও বড্ড কম। তবু আবছা আলোতেও সে যা দেখল, তাতে ইন্দ্রর কথায় আর সন্দেহ নেই। সে গগনের দিকে চেয়ে বলে, “গগনবাবু, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।”

“অভয় মানে! তোর আবার ভয়ের আছেটা কী?”

“বলছি, এ-মোহর গলিয়ে আপনি যা সোনা পাবেন, সেটা এমন কিছু নয়। পান অনেক বাদ যাবে। কিন্তু.”

গগন ব্যগ্র গলায় বলে, “কিন্তুটা আবার কী রে?”

“ভাবছি ভগবান যাকে দেন তাকে ছপ্পড় ফুড়েই বুঝি দেন। আপনার কপালটা খুবই ভাল।”

গগনের মুখে একটা লোভনীয় ভাব জেগে উঠলেও মনের ভাব চেপে রেখে সে গম্ভীর হয়ে বলে, “কপালের কথা বলছিস হরিপদ! ঘরের সোনা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর বলছিস ভগবান ছপ্পর ছুঁড়ে দিচ্ছেন! এত দুঃখেও বুঝি আমার হাসিই পাচ্ছে। তা হ্যাঁ রে হরিপদ, একটু ঝেড়ে কাসবি বাবা? তাপিত এ প্রাণটা জুড়োবার মতো কোনও লক্ষণ কি দেখছিস রে ভাই? মেঘের কোলে কি আবার কোনওদিন রোদ হাসবে রে?”

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, "বলে লাভ কী গগনবাবু? গরিবের কথায় আপনার হয়তো প্রত্যয় হবে না। পেটের দায়ে উঞ্ছবৃত্তি করে করে মানুষ হিসাবে আমাদের দামই কমে গেছে।"

গগন হরিপদর হাতটা খপ করে জাপটে ধরে বলে, "আর দগ্ধে মারিস ভাই। বলে ফ্যাল।"

হরিপদ মাথা চুলকে বলে, "যা বলব তা বিশ্বাস হবে তো?"

"খুব হবে। বলেই দ্যাখ না। তোর হল জহুরির চোখ। আজ না হয় আতান্তরে পড়ে তোর দুর্দশা যাচ্ছে। কিন্তু গুণী লোকের কি কদর না হয়ে উপায় আছে রে! তোরও একদিন মেঘের কোলে রোদ হাসবে, দেখিস।"

"আমার রোদ হাসবে কি না জানি না, তবে আপনার রোদ তো একেবারে হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে লেগেছে গগনবাবু। এ যা জিনিস দেখালেন তাতে আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তবে ভগবানের একটা দোষ কী জানেন গগনবাবু, তিনি বড্ড একচোখো লোক। তিনি কেবল তেলা মাথাতেই তেল দেন। এই যে মনে করুন আপনি, আপনার ঘরদোরে তো মালক্ষ্মী একেবারে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, তবু এই দুষ্প্রাপ্য মোহরের থলিটাও যেন আপনাকে না দিলেই ভগবানের চলছিল না। এর একখানা মোহর পেলেই আমার–শুধু আমার কেন, এই গোটা গাঁয়ের ভাগ্য ফিরে যেত, তা জানেন? আমার সব ধারকর্জ শোধ হয়েও সাতপুরুষের বন্দোবস্ত হয়ে যেত।"

গগন আকুল হয়ে বলে, "ওরে, ওরকম বলিসনি। আর একটু ঝেড়ে কাস ভাই, পেট খোলসা করে বল। তোর সেই পঞ্চাশ টাকা ধার তো! বেড়ে-বেড়ে শ'চারেক হয়েছে। এই আজই সেই ধার আমি বাতিল করে দিচ্ছি। কাগজপত্র হাতের কাছেই আছে। দাঁড়া।"

এই বলে গগন আলমারি খুলে কোথা থেকে একখানা কাগজ বার করে হরিপদকে দেখিয়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ-গ্র্যাচ করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, “এবার বল ভাই। তোর পাওনাও মার যাবে না। পঞ্চাশের জায়গায় একশো দেব।”

হরিপদ গলাখাকারি দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, “কিছু মনে করবেন না গগনবাবু, আমি হলুম গে নকুড় কর্মকারের নাতির নাতি। নকুড় কর্মকার ছিলেন রায়দিঘির রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের খাস স্বর্ণকার। আমরা এইসব পুরনো মোহর, ধাতুর জিনিস, গয়নাগাটির জহুরি। আমাদের বংশের ধারা এখনও লোপ পায়নি। এই মোহর সম্পর্কে আমার মত যদি সত্যিই চান তা হলে উপযুক্ত নজরানাও দিতে হবে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা।”

গগন চোখ উলটে ধপাস করে চৌকির ওপর বসে পড়ে বলে, “ওরে, আমার চোখেমুখে জল দে। এ যে হরিপদর বেশ ধরে-ঘরে ঢুকেছে এক ডাকাত!”

“ঘাবড়াবেন না গগনবাবু। এইসব মোহরের আসল দাম শুনলে পাঁচ হাজার টাকাকে আপনার স্রেফ এক টিপ নস্যি বলে মনে হবে।”

চোখ পিটপিট করে গগন বলে, “সত্যি বলছিস তো! ধোঁকা যদি দিস তা হলে কিন্তু...।”

একটু থেমে হরিপদ বলে, “ধোঁকা দেওয়ার মতো বুকের জোর আমার নেই। দরকার হলে আমার গদান নেবেন। কালু আর পীতাম্বর তো আপনার হাতেই আছে।”

গগন ধড়মড় করে উঠে বলে, “আহা, আবার ওকথা কেন? কালু আর পীতাম্বর এই পথ দিয়েই কোথায় যাচ্ছিল, খিদে-তেষ্টায় কাহিল, এসে হাজির হল। তা আমি তো ফেলতে পারি না, শত হলেও অতিথি। একটু ফলার করেই চলে যাবে। কথাটা চাউর করার দরকার নেই। হ্যাঁ, এখন মোহরের কথাটা হোক!”

"হবে। মোহর সম্পর্কে আপনাকে যা বলব তার জন্য পাঁচটি হাজার টাকা এখনই আগাম দিতে হবে গগনবাবু। নইলে মুখ খোলা সম্ভব নয়। এ-আমাদের বংশগত বিদ্যে। বিনা পয়সায় হবে না।"

গগন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত চোখে থেকে বলে, "কুলুঙ্গিতে মা কালীর একটা ফোটো আছে দেখছিস? ওই ফোটো ছুঁয়ে বল যে, সত্যি কথা বলছিস।"

হরিপদ ফোটো ছুঁয়ে বলে, "সত্যি কথাই বলছি।"

"পাঁচ হাজার টাকা কত টাকায় হয় জানিস? একখানা-একখানা করে গুনলে গুনতে কত সময় লাগে জানিস? জন্মে কখনও দেখেছিস পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে?"

হরিপদ একটু বিজ্ঞ হাসি হেসে বলে, "আপনি এই মোহর নিয়ে গঞ্জের নব কর্মকার বা বসন্ত সেকরার কাছে গিয়ে যদি হাজির হন তা হলে তারা চটপট মোহর গলিয়ে দেবে, মূর্খরা তো জানেও না যে, এইসব মোহর এক-একখানার দামই লাখ-লাখ টাকা। আমাকে না ডেকে যদি তাদের কাউকে ডাকতেন, তা হলে আপনার লাভ হত লবডঙ্কা।"

গগন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়ে বলল, "কত টাকা বললি?"

"লাখ-লাখ টাকা। সব মোহরের সমান নয়। এক-এক আমলের মোহরের দাম এক-একরকম। এগুলো সবই ঐতিহাসিক জিনিস। দুনিয়ার সমঝদাররা পেলে লুফে নেবে। তবে হুট বলে বিক্রি করতে বেরোবেন না যেন। তাতে বিপদ আছে। পুলিশ জানতে পারলে খপ করে ধরে ফাটকে দিয়ে দেবে। এর বাজার আলাদা। চোরাপথে ছাড়া বিক্রি করা যাবেও না। কিন্তু কথা অনেক হয়ে গেছে। যদি হরিপদ কর্মকারের মাথা ধার নেন তবে তার দক্ষিণা আগে দিয়ে দিন।"

গগনের হাত-পা কাঁপছে উত্তেজনায়। কাঁপা গলাতেই সে বলে, "ওরে, আর একটু বল। শুনি। এ যে অমাবস্যায় চাঁদের উদয়!"

"বলতে পারি। কিন্তু আগে দক্ষিণা।"

গগন ফের আলমারি খুলল এবং কম্পিত হাতে সত্যিই পাঁচ হাজার টাকা গুনে হরিপদর হাতে দিয়ে বলে, "যদি আমাকে ঘোল খাইয়ে থাকিস

তা হলে নির্বংশ ভিটেছাড়া করে দেব কিন্তু।"

"সে জানি।" বলে হরিপদ টাকাটা ট্র্যাকে গুঁজল। তারপর বলল, "মশাই, আমি যদি লোকটা তেমন খারাপই হতুম, তা হলে এই মোহরের আসল দাম কি বলতুম আপনাকে? বরং এর একখানা সোনার দামে কিনে নিয়ে গিয়ে লাখ টাকা কামিয়ে নিতুম। সে তুলনায় পাঁচ হাজার টাকা কি টাকা হল?"

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, "না, তুই ভাল লোক। তোর মনটাও সাদা। এবার মোহরের কথা বল।"

হরিপদ মোহরগুলো মেঝের ওপর উপুড় ঢেলে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল, "মোট দুশো এগারোখানা আছে, তাই না?"

গগন একখানা শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"এর মধ্যে নানা জাত আর চেহারার মোহর দেখতে পাচ্ছেন তো! কোনওটা তেকোনা, কোনওটা ইংরেজি 'ডি' অক্ষরের মতো, কোনওটা ছ'কোনা, কোনওটা পিরামিডের মতো– এগুলোই পুরনো। হাজার-দেড় হাজার বছর আগেকার। এগুলোর দামই সবচেয়ে বেশি। গোলগুলো তো পুরনো নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এগুলোও কম যায় না। এগুলো যদি গলিয়ে ফেলতেন গগনবাবু, তা হলে যে কী সর্বনাশই না হত।"

"পাগল নাকি! গলানোর কথা আর উচ্চারণও করিস না, খবর্দার।"

হরিপদ মাথা চুলকে বলে, “কিন্তু মুশকিল কী জানেন, এসব যে অতি সাঙ্ঘাতিক মূল্যবান জিনিস?”

“বুঝতে পারছি রে। তা হ্যাঁ রে, দুশো এগারোর সঙ্গে লাখ লাখ গুণ দিলে কত হয়?”

“তার লেখাজোখা নেই গগনবাবু, লেখাজোখা নেই। আর সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল।”

গগন তেড়ে উঠে বলে, “কেন, দু’শো এগারোর সঙ্গে লাখ-লাখ গুণ দিতে আবার মুশকিল কিসের? আজকাল তো শুনি গুণ দেওয়ার যন্ত্র

বেরিয়ে গেছে! ক্যারেকটার না ক্যালেন্ডার কী যেন বলে!”

“ক্যালকুলেটার।”

“তবে? ওই যন্ত্র একটা কিনে এনে ঝটপট গুণ দিয়ে ফেলব। মুশকিল কিসের?”

“গুণ তো দেবেন। গুণ দিয়ে কুলও করতে পারবেন না। কিন্তু ৫৮

আমি ভাবছি অন্য কথা। এত টাকার জিনিস আপনার ঘরে আছে জানলে যে এ বাড়িতে ভাগাড়ে শকুন পড়ার মতো দশা হবে! ডাকাতরা দল বেঁধে আসবে যে! কুকুর, বন্দুক, দরোয়ান দিয়ে কি ঠেকাতে পারবেন? গাঁয়ে-গঞ্জে কোটি-কোটি টাকার জিনিস তো মোটেই নিরাপদ নয়।”

গগন চোখ স্থির করে বলে, “কত বললি?”

“কোটি-কোটি।”

“ভুল শুনছি না তো! কোটি-কোটি?”

“বহু কোটি গগনবাবু। আর ভয়ও সেখানেই।”

গগন হঠাৎ আলমারি খুলে একটা মস্ত ভোজালি বের করে ফেলল। তারপর তার মুখ-চোখ গেল একেবারে পালটে। গোলপানা অমায়িক মুখোনা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, চোখে সাপের ক্রুরতা। চাপা গলায় গগন বলে, "মোহরের খবর তুই ছাড়া আর কেউ জানে না। তোকে মেরে পাতালঘরে পুঁতে রেখে দিলেই তো হয়।"

হরিপদ দুপা পেছিয়ে গিয়ে সভয়ে বলে, "আজ্ঞে, আমার কাছ থেকে পাঁচকান হবে না। সে ভয় নেই। কিন্তু আপনারও বুদ্ধির বলিহারি যাই। এই হরিপদ কর্মকার ছাড়া ও-মোহর বেচবেন কী করে? মোহরের সমঝদার পাবেন কোথায়? এ-তল্লাটে তেমন সেকরা একজনও নেই যে, এইসব মোহরের আসল দাম কত তা বলতে পারে। যদিবা শহরে-গঞ্জে কাউকে পেয়েও যান সে আপনাকে বেজায় ঠকিয়ে দেবে বা মোহরের গন্ধ পেয়ে পেছনে গুণ্ডা বদমাশ লেলিয়ে দেবে। কাজটা সহজ নয় গগনবাবু।

গগন সঙ্গে-সঙ্গে ভোজালিটা খাপে ভরে আলমারিতে রেখে একগাল হেসে বলে, "ওরে, রাগ করলি নাকি? আমি তোকে পরীক্ষা করলাম।"

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, "আমার আর পরীক্ষায় কাজ নেই মশাই, ঢের শিক্ষা হয়েছে। আমার পৈতৃক প্রাণের দাম মোহরের চেয়েও বেশি। আমি আপনার কাজ করতে পারব না। এই নিন, আপনার পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নিন।"

এই বলে ব্ল্যাক থেকে টাকা বের করে হরিপদ গগনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

গগন ভারী লজ্জিত হয়ে বলে, "অমন করিসনি রে হরিপদ। একটা মানুষের মাথাটা একটু হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল বলে তুই এই বিপদে তাকে ত্যাগ করবি? তুই তো তেমন মানুষ নোস রে।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। আর বিশ্বাস না করলে এই মোহর হাতবদল করা আপনার কর্ম নয়। পাঁচ হাজার টাকায় তো আর মাথা কিনে নেননি।"

গগনবাবু পুনর্মূষিক হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, “দাঁড়া ভাই, দাঁড়া। আমারও মনে হচ্ছিল যেন, পাঁচ হাজার টাকাটা বড্ড কমই হয়ে গেল। তোকে আমি আরও দশ হাজার দিচ্ছি ভাই, আমাকে বিপদে ফেলে যাস না।”

“না মশাই, আপনার ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না। এখন ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু পরে বিপদে ফেলবেন।”

“আচ্ছা, আরও দশ। মোট পঁচিশ হাজার দিলে হবে? না, তাও গাল উঠছে না তোর? ঠিক আছে, আরও পাঁচ ধরে দিচ্ছি না হয়।”

বলে গগন আলমারি থেকে টাকার বান্ডিল বের করে মোট ত্রিশ হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, “এবার একটু খুশি হ ভাই। কিন্তু কথা দে, তোর মুখ থেকে মোহরের খবর কাকপক্ষিতেও জানবে না। মা কালীর ফোটোটা ছুঁয়েই বল একবার।”

হরিপদ কালীর ফোটো ছুঁয়ে বলে, “জানবে না। আপনি মোহরগুলো গুনে-গুনে ব্যাগে ভরে আলমারিতে তুলে রাখুন। আলমারির চাবি সাবধানে রাখবেন। আর চারদিকে ভাল করে চোখ রাখা দরকার।”

“তা আর বলতে! তবে বড় ভয়ও ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছিস। আজ রাতে আর ঘুম হবে না যে রে।”

“ঘুম কম হওয়াই ভাল। সজাগ থাকাও দরকার। আমিও বাড়ি গিয়ে একটু ভাবি গে।”

“যা, ভাই যা। ভাল করে ভাব। কত যেন বললি? কোটি-কোটি না

কী যেন! ঠিক শুনেছি তো!”

“ঠিকই শুনেছেন। এবার আমি যাই, দরজাটা খুলে দিন।”

আলমারি বন্ধ করে চাবি টাকে খুঁজে গগন দরজা খুলে দিল।

হরিপদ গগনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাজারে গিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজ কিনে ফেলল। একশিশি ঘি অবধি। বাড়িতে ফিরে যখন বাজার ঢেলে ফেলল, তখন অধরা অবাক, "এ কী গো! এ যে বিয়ের বাজার!"

"এতদিনে ভগবান বুঝি মুখ তুলে একটু চাইলেন। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করো তো। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"আবার কোথায় যাচ্ছ?"

"জামাকাপড়ের দোকানে। তোমার জন্য শাড়ি, অলঙ্কারের জন্য প্যান্ট আর জামা নিয়ে আসি। ফিরে এসে সব বলব'খন। এখন সময় নেই। সন্ধে অনেকক্ষণ হয়েছে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

৫. অঙ্কের সার রাসমোহনবাবু

অঙ্কের সার রাসমোহনবাবু খুবই ভুলোমনের মানুষ। কাছাকোছা ঠিক থাকে না, এক রাস্তায় যেতে আর-এক রাস্তায় চলে যান, বৃষ্টির দিনে ছাতা নিতে গিয়ে ভুল করে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, প্রায়ই চকের বদলে পকেট থেকে কলম বের করে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে চেষ্টা করেন। বাজার করতে গিয়ে আজ রাসমোহনবাবু ভুল করে বাজার করার বদলে নব হাজামের কাছে বসে দাড়িটি কামিয়ে নিলেন। নব অবশ্য মিনমিন করে একবার বলল, "সকালেই তো একবার কামিয়ে দিয়েছি, আবার বিকেলেই কেন কামানোর দরকার পড়ল কে জানে বাবা। আপনি তো তিন দিন বাদে বাদে কামান।" দাড়ি কামিয়ে রাসমোহনবাবু খুশিমনে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধের মুখে বটতলায় হঠাৎ খপ করে কে যেন পেছন থেকে তাঁর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "আপনার যে দুটো হাতই বাঁ হাত মশাই।"

রাসমোহনবাবু খুবই চমকে গিয়ে পেছন ফিরে একটা হুমদো চেহারার লোককে আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "আমাকে কি অ্যারেস্ট করলেন দারোগাবাবু? কিন্তুটা খুনটা তো আমি করিনি। কে করেছে তাও জানি না। আসলে কেউ খুন হয়েছে কি না। তাও বলতে পারব না।"

লক্ষ্মণ পাইক বিরক্ত হয়ে বলে, "খুনখারাপির কথা উঠছে কিসে? আসল কথাটাই চেপে যাচ্ছেন মশাই, আপনার দুটো হাতই যে বাঁ হাত!"

এ কথায় রাসমোহনবাবু খুবই চিন্তিতভাবে তাঁর হাত দুখানার দিকে তাকালেন। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলেন না। অত্যন্ত উদ্বেগের গলায় বললেন, "তাই তো! এ তো খুব গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। এঃ, দু-দুটো বাঁ হাত নিয়ে আমি এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ তো ভুলটা ধরেও দেয়নি! ডান হাতের কাজ তা হলে এতকাল আমি বাঁ হাতেই করে এসেছি! ছিঃ ছিঃ! একেবারে খেয়াল করিনি তো! এখন কী হবে? এ তো খুব মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি!"

লক্ষ্মণ তার টর্চটা একবার পট করে জ্বেলে রাসমোহনের হাত দুটো দেখে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, "না মশাই, আপনারও তো দেখছি দুটো দুরকমেরই হাত। তা হলে দুই বাঁ-হাতওয়ালা লোকটা কোথায় গা-ঢাকা দিল বলুন তো! আচ্ছা আপনার নাম কি দন্ত্য ন দিয়ে শুরু?"

রাসমোহন সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "দন্ত্য ন? দাঁড়ান-দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখতে হবে। যতদূর মনে পড়ছে আমার নাম রাসনোহন নস্কর। রাসমোহন তো দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হচ্ছে না মশাই। তা দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হলে কি কিছু সুবিধে হত?"

লক্ষ্মণ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলে, "সেই সকাল থেকে দন্ত্য ন আর বাঁ হাত খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে পড়লাম মশাই। তা তোক দুটো যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে সেটাই বুঝতে পারছি না। নাঃ, আরও দেখতে হচ্ছে।"

লক্ষ্মণ হনহন করে এগিয়ে গেল। রাসমোহনবাবু খুবই চিন্তিতভাবে নিজের বাড়ি মনে করে ভুলবশত স্কুলের অন্ধকার দালানে উঠে একটা ক্লাসঘর ফাঁকা পেয়ে সেখানে ঢুকে বসে রইলেন।

নগেন মুদি সবে দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় লক্ষ্মণ এসে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াল, "এই যে নগেনবাবু, তোমার নাম তো দন্ত্য ন দিয়েই শুরু হে!"

নগেন রোগাভোগা রগচটা লোক। খিঁচিয়ে উঠে বলে, "তাতে কী হয়েছে? দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হলে কি নামটা পচে গেছে? নাকি তোমার পাকা ধানে মই পড়েছে?"

লক্ষ্মণ বুক চিতিয়ে বলে, "তুমি লোক সুবিধের নও বাপু। যাদের নাম ন দিয়ে শুরু হয়, তারা খুব খারাপ লোক।"

নগেন দোকানের ঝাঁপটা পটাং করে ফেলে ফোঁস করে ওঠে, "তোমার মাথায় একটু ছিট আছে নাকি হে! ন দিয়ে নামের লোক যদি খারাপই হয়, বাপু তা হলে নগেন কেন,

ন্যাপলা নেই নাকি? ওই যে নেপাল সাহা দু বেলা খদ্দেরের গলা কাটছে, ঝলমলে দোকান সাজিয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছে, তার কাছে যাও না। গিয়ে একবার বীরত্বটা দেখিয়ে এসো দেখি, কেমন মানুষ বুঝি তা হলে! আর শুধু নেপালই বা কেন, ওই যে নবকেষ্ট, মাছ বেচে লাল হয়ে গেল, তার দাঁড়িপাল্লা কখনও উলটে দেখেছ? জন্মে কখনও কাউকে পাল্লার ফের দেখায় না, তার পাল্লার নীচে অন্তত দেড়শো গ্রাম চুম্বক লোহা সাঁটা আছে। যাও না তার কাছে। ইঃ, উনি আমাকে ন চেনাতে এসেছেন!”

লক্ষ্মণ একটু ফাঁপড়ে পড়ে গেল। ন দিয়ে বিস্তর লোক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা আসল ন, সেইটে বোঝা কঠিন। আর বাঁ-হাতওলা লোকটা যে কোথায় ঘাপটি মেরেছে তাই বা কে জানে বাবা। তবে লক্ষ্মণ সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয়।

ইটখোলার দিকে কদমতলায় হাঁদুর পান-বিড়ির দোকানে দুটো লোক পান কিনতে দাঁড়িয়েছে। টেমির আলোয় তাদের ভাল ঠাহর হচ্ছে না, কিন্তু পেছন থেকে দেখে বেশ লম্বা-চওড়া মনে হল। লক্ষ্মণ কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল, দুজনের কোমরেই দু'খানা ল্যাজা গোঁজা রয়েছে। এরা লোক সুবিধের বলে মনে হল না তার। আর বেঁটে লোকটা তার ডান হাতখানা কি ইচ্ছে করেই একটু আড়াল করতে চাইছে? ওটি কি আসলে বাঁ হাত? দুটো হাতই কি তবে বাঁ? লক্ষ্মণ অবশ্য হুট করে গিয়ে লোকটাকে যাচাই করতে সাহস পেল না। সে সাত ঘাটের জল খেয়ে মানুষ চিনেছে। এই টেমির আলোতেও এদের পাশ-ফেরানো মুখ দেখে সে বুঝে গেল, এরা লাশটাস নামায়। লক্ষ্মণ একটু দূর থেকে নজর রাখতে লাগল। গতিবিধিটা একটু দেখতে হবে।

সেই থেকে গৌরগোবিন্দর মনটা আবার ফিঙেপাখির মতো নাচানাচি করছে। অনেকদিন বাদে শিমুলগড়ে একখানা জম্পেশ ঘটনা ঘটেছে বটে। গুম খুন আর দুশো এগারোখানা মোহর। কালী কাপালিকটা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে বটে, তার মধ্যে কি আর একটু-আধটু সত্যি কথার ভেজাল একেবারেই থাকবে না? গৌরগোবিন্দর মন বলছে, কথাটা একেবারে ফ্যালনা নয়। তা কালী কাপালিককে সকালে একঘটি দুধ খাইয়ে কথাটা আদায় করার পর গৌরগোবিন্দ ভেবেছিলেন ঘটনাটা চেপে রাখবেন। কারণ দীর্ঘদিনের

অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, কোনও-কোনও খবর চেপে রাখতে পারলে আখেরে তা থেকে লাভই হয়। সেই ছেলেবেলায়, সদিপিসির অম্বুবাচীর দিন ভুল করে এক ডেলা গুড় খেয়ে ফেলার কথা চেপে রেখেছিলেন বলেই দু গণ্ডা পয়সা আদায় হয়েছিল। তাঁর মেজোখুড়ো যে তামাক খেতেন সেকথাটা দাদুর কাছে চেপে যেতেন বলেই খুড়োমশাইয়ের কাছ থেকে যখন-তখন ঘুড়িটা লাটিমটা আদায় হত। সেইসব পুরনো কথা ভেবে মোহর আর গুম খুনের ব্যাপারটাও চেপেই রেখেছিলেন গৌরগোবিন্দ। কিন্তু, গোপন কথা অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁর পেট ফেঁপে চোঁয়া ঢেকুর উঠতে লাগল। গায়ে ঘাম হতে লাগল। কানে দুশো এগারোখানা মোহরের ঝনঝন শব্দে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীরে আইঢাই, ঘনঘন জল খেতে হচ্ছিল। সে এক ভারী অস্বস্তিকর অবস্থা। গৌরগোবিন্দ তাই ছাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। বিজয় মল্লিক, পটল গাঙ্গুলি, নটবর ঘোষ, গাঁয়ের আরও সব মাতব্বরদের খবরটা দেওয়ার পর পেটের বায়ু নেমে গেল, গায়ের ঘাম শুকোল, কানের শব্দটাও বন্ধ হল।

কিন্তু মুশকিল হল কথাটা কেউ গায়ে মাখছে না। কালীটা তো গাড়ল আর আহাম্মক, আজগুবি সব কথা বলে বেড়ায়, তার কথায় প্রত্যয় হবে কার? সবাই শুনে হাসছে। হারান সরকার তো বলেই বসল, "তোমারও কি একটু বয়সের দোষ দেখা দিচ্ছে নাকি গো গৌরঠাকুরদা! নইলে কালীর কথায় মেতে উঠলে কেন?"

তবে যে-যাই বলুক, ভগবানের দয়ায় কালীর মুখ থেকে যদি এই একটা সত্যি কথাও জন্মে বেরিয়ে থাকে, তা হলে গাঁয়ে কী হুলুস্থুলুটাই না পড়ে যাবে! সেই কথা ভেবে মনটা সত্যিই আজ নেচে বেড়াচ্ছে গৌরগোবিন্দর। কতকাল পরে এই ঝিমধরা, ম্যাদাটে মাকা, মরা গাঁয়ে একটা জম্পেশ ঘটনা ঘটেছে! কটা দিন গাঁ একটু গরম থাকবে। মাঝেমধ্যে উত্তরের মাঠে সার্কাস এলে যেমন হয়, রথের মেলা বা মহাকালীর পুজোয় যেমন একটু বেশ গরম থাকে গা, অনেকটা তেমনই। তবে ভেতরে গুহ্য কথা থাকায় এটার স্বাদই আলাদা। খুন! চোরাই মোহর! উঃ, খুব জমে গেছে ব্যাপারটা। একেবারে লঙ্কার আচারের

মতো। ঝাল ঝাল, টক-টক, মিষ্টি-মিষ্টি। ভাবতে-ভাবতে দুপুরে আর ঘুমটাই হল না গৌরগোবিন্দর।

সন্ধেবেলায় এইসব, বৃত্তান্ত নিয়েই আজ চণ্ডীমণ্ডপে একটা জমায়েত হয়েছে। মাতব্বররা সবাই আছেন। মধ্যমণি পটল গাঙ্গুলি বেশ জমিয়ে বসে বললেন, "সব শোনো তোমরা, গৌরঠাকুরদা আজ কালী কাপালিকের কাছে এক আজগুবি গল্প শুনে এসেছেন। কালকে গগনের বাড়ি যে চোর ছোঁকরাটা ঢুকেছিল সে নাকি খুন হয়েছে, আর তার আত্মা নাকি আমাদের কালী কাপালিকের কাছে এসে গভীর রাতে নাকিকান্না কেঁদে গেছে যে, তার থলিতে দু'শো এগারোখানা মোহর ছিল। সেসব নাকি গগন গাপ করেছে।"

পরান সরকার মুখোনা তেতো করে বলল, "অ। তা এই আষাঢ়ে গল্প শোনার জন্যই কি হাঁটুর ব্যথা নিয়ে এতদূর নেংচে-নেংচে এলাম! ওই কালী তো কত কী বলে বেড়ায়! নাঃ, যাই, গিয়ে হাঁটুতে একটু সেঁক-তাপ দিই গে।"

নটবর ঘোষ বলে ওঠে, "আমারও একটা সমস্যা হয়েছে। গগনের ওই গুন্ডা পাইক লক্ষ্মণটা বড় হুড়ো দিচ্ছে আমায়। রাম বিশ্বাসদা আজ সকালে একটু সাঁটে কী একটা কথা বলেছিল, সেই থেকে সে বড় হামলা করছে আমার ওপর। আমার নাকি দুটো হাতই বাঁ হাত, আমার নামের আদ্যক্ষর দন্ত্য ন বলে নাকি আমি তোক খুব খারাপ। আমি আপনাদের কাছে এর একটা বিহিত চাই। এ তো বড় অরাজকতা হয়ে উঠল মশাই।"

হারু সরখেল বলে উঠল, "কথাটা মিথ্যে নয়। আমাকেও আজ চৌপর দিন লক্ষ্মণকে বোঝাতে হয়েছে যে, আমার নাম নাড় নয়, হারু। ব্যাটা কিছুতেই বুঝতে চায় না।"

ঠিক এ-সময়ে হঠাৎ একটা রাখাল ছেলে দৌড়তে-দৌড়তে এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে থমকে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "দাদুরা সব এখানে বসে রয়েছ! ওদিকে যে কালী কাপালিকে পেটাই হচ্ছে!"

শুনে মাতব্বররা সব হাঁ-হ করে ওঠে। পটল গাঙ্গুলি বলে ওঠেন, "পেটাচ্ছে মানে! কে পেটাচ্ছে রে ছোঁকরা? কেনই বা পেটাচ্ছে?"

রাখাল ছেলেটা বলে, "ভিন গাঁয়ের লোক।"

নটবর ঘোষ হঠাৎ লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে বলে, "কেন, বাইরের লোক এসে কালীকে পেটাবে কেন? শিমুলগড় কি মরে গেছে? কালী এ-গাঁয়ের লোক, পেটাতে হলে তাকে আমরা পেটাব। চলুন তো সবাই, দেখে আসি ব্যাপারটা! এ কি অরাজকতা নাকি?"

রাখাল ছেলেটা বলে, "উদিকে যেয়ো না কতা। বাইরের লোক হলেও তারা হলেন কালু আর পীতাম্বর।"

নাম দুটো শুনেই সভাটা হঠাৎ ঠাণ্ডা মেরে নিশ্চুপ হয়ে গেল। নটবর ঘোষ আবার ভিড়ের মধ্যে টুপ করে বসে গা-ঢাকা দিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে গৌরগোবিন্দ হঠাৎ ঝিমুনি কাটিয়ে খাড়া হলেন, "কালীকে পেটাচ্ছে! সর্বনাশ! সে যে আমাদের রাজসাক্ষী! কালী খুন-টুন হয়ে গেলে যে মামলার কিনারা হবে না! এ যে সব ভেস্তে যাবে দেখছি।"

বলে হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে গৌরগোবিন্দ চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে তাঁর জুতো খুঁজতে লাগলেন ব্যস্ত হয়ে।

বিজয় মল্লিক হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, "করো কী ঠাকুরদা, তারা দুটি যে সাক্ষাৎ যমের স্যাঙাত! মহাকালীর পুজোয় ওই কালুটা যে এক হাতে এক কোপে মোষের গলা নামিয়ে দেয়, দ্যাখোনি? আর পীতাম্বরটা তো চরকির মতো তলোয়ার ঘোরায়।"

গৌরগোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলেন, "তা বলে রাজসাক্ষী হাতছাড়া করব? এতদিন বাদে একটা ঘটনা ঘটল গাঁয়ে, সেটার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেব? আর কালু-পীতাম্বর যখন আসরে নেমে পড়েছে তখন বলতেই হবে বাপু, কালী কাপালিকের কথায় একটু যেন সত্যি কথাও আছে। না বাপু, আমাকে দেখতেই হচ্ছে ব্যাপারটা।"

রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের এককোণে বসে বাতাসে ট্যাড়া কাটছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কালীর এখনই মৃত্যুযোগ নেই, সকালেই কপালটা দেখেছি ভাল করে।"

গৌরগোবিন্দ আর কোনও দৃকপাত না করে ছুটতে লাগলেন।

ইটখোলায় কালী কাপালিকের থানে দৃশ্যটা একটু অন্যরকম। যেমনটা ভাবা গিয়েছিল তেমনটি নয়।

সন্ধেবেলায় কালী একটু সিদ্ধি-টিদ্ধি খায়। বান মারে, ব্যোম-ব্যোম করে আর তার তিন-চারজন চেলা ধুনির আগুনে রান্না চাপায়।

বেশ শান্ত নিরিবিলি জায়গা। হাওয়া দিচ্ছে। চারদিক বেশ খোলামেলা। কালী তার শিষ্যদের বলছিল, "গগন ব্যাটার বুকের পাটা দেখনি তো! কী এমন চাইলুম রে বাবা! চোরাই মোহরগুলোর কথা তো পাপমুখে উচ্চারণও করিনি। এমনকী খুনটার কথাও চেপে গেছি। তা তার...একটা দাম দিবি না? নিজের জন্য কী চেয়েছি? পাঁচটা ভক্ত আসবে, ভদ্রলোকেরা আসবে, তীর্থ হিসাবে শিমুলগড়েরই নাম হবে। কয়েক হাজার ইট আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট হলেই হয়ে যেত। তার বদলে কয়েক বস্তা পুণ্যি! আর আধসের করে দুধ-সেটাও তার বড্ড বেশি মনে হল নাকি রে? ভক্তকে দুধ খাওয়ালে ভগবান খুশি হন, সেইটেই বুঝল না ব্যাটা পাপী।"

অন্ধকারে বাবলাবনের ভেতরের শুড়িপথটা দিয়ে দুটো ছায়ামূর্তি আসছিল। তারা আড়াল থেকে কথাটা শুনতে পেল। শুনে পীতাম্বর একখানা হাঁক পাড়ল, "এই যে, খাওয়াচ্ছি তোমাকে দুধ! আর ইটের বন্দোবস্তও হচ্ছে।"

কালী প্রথমটায় কিছু বুঝে উঠবার আগেই পেল্লায় চেহারার দুটো লোক এসে তার ওপর পড়ল। গালে বিশাল এক থাবড়া খেয়ে কালী চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেললে রে!"

চেলারা ফটাফট আড়ালে সরে গেল। চেঁচামেচি শুনে আশপাশ থেকে ছুটে এল কিছু লোক। তবে তারা বেশি এগিয়ে এল না। কালু আর পীতাম্বরকে সবাই চেনে।

কালু পর-পর আরও দুখানা চড় কষাতেই পীতাম্বর বলে উঠল, "আহ, খামোখা চড়গুলো খরচা করছিস কেন? বত্রিশটা টাকার বেশি তো আর কঞ্জুষটার কাছ থেকে আদায় হবে না। আটখানা কর।" এই বলে ভূপাতিত কালীর দিকে চেয়ে একটা বড় করে দম নিয়ে বিকট গলায় বলে উঠল, "এখন যদি হাঁড়িকাঠে ফেলে মায়ের নামে তোর গলাখানা নামিয়ে দিই তা হলে কী হয়? গুণ্ডামি আর গা-জোয়ারি তা হলে কোথায় থাকবে রে পাষণ্ড? ভাল-ভাল মানুষদের ওপর হামলা করে দুধ আর ইট-সিমেন্ট আদায় করছিস যে বড়, অ্যাঁ! গগন সাঁপুইয়ের টাকা বেশি দেখেছিস?"

কালী উঠল না। উঠলেই বিপদ। শুয়ে-শুয়েই বলল, "টাকা কোথায় গো পীতাম্বরদাদা? সব মোহর।"

কালু একটা রদ্দা তুলেছিল, পীতাম্বরও কড়কে দেবে বলে হাঁ। করেছিল, থেমে গেল দুজনেই। "মোহর!"

কালী এবার উঠে বসে গা থেকে একটু ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বলল, "সবই বুঝি গো পীতাম্বরদাদা, দিনকাল খারাপই পড়েছে। নইলে ওই ছুঁচোটার হয়ে এই শস্তার কাজে নামবার লোক তো তোমরা নও। তা কতয় রফা হল গগনের সঙ্গে?"

পীতাম্বর গম্ভীর গলায় বলে, "তা দিয়ে তোর কী দরকার? মুখ সামলে কথা বলবি।"

কালী দুঃখের গলায় বলে, "সে তোমরা না বললেও আন্দাজ করতে কষ্ট নেই। খুব বেশি হলে পাঁচ-সাতশো টাকায় রফা হয়েছে। আর কাল রাতেই কি না পাষণ্ডটা দুশো এগারোখানা মোহর বেমালুম গাপ করে ফেলল ভালমানুষ ছোঁকরাটার কাছ থেকে। ধর্মে সবই সইছে আজকাল হে। দুশো এগারোখানা মোহর গাপ করে সেই ছোঁড়াকে মেরে কোথায় গুম করে ফেলল কে জানে! আমার দোষ হয়েছে কী জানো, মোহরের বৃত্তান্ত

আমি জেনে ফেলেছিলাম। সেকথা যাক, দিনকাল খারাপ পড়েছে বুঝতে পারছি, তোমাদের মতো বড়দরের ওস্তাদেরা যখন পাঁচ-সাতশো বা হাজার টাকায় কাজে নামছ তখন আকালই পড়েছে বলা যায়। তবে কি না, মোহরগুলো গগনের ন্যায্য পাওনা নয়। কিন্তু সেকথা তাকে বলবার সাহসটা আছে কার বলো?"

পীতাম্বর কালুর দিকে চেয়ে বলে, "দরটা বড্ড কমই হয়ে গেছে না রে?"

কালু খুব গম্ভীর মুখে বলে, "তোর আক্কেল যে কবে হবে! অত কমে কেন যে এত মেহনত খরচা করলি! চড়প্রতি দশ টাকা করে ধরলে হত।"

পীতাম্বর দুটো হাত ঝেড়ে চাপা গলায় বলে, "যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। আর একটাও চড় খরচ করার দরকার নেই। বকাঝকাও নয়। বাহান্ন টাকার কাজ আমরা তুলে দিয়েছি।"

কালু বলল, "তার বেশিই হয়ে গেছে।"

পীতাম্বর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর কালীর দিকে চেয়ে বলে, "যাঃ, খুব বেঁচে গেলি আজ। এবার বৃত্তান্তটা একটু খোলসা করে বল তো?"

কালী ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, "কী বললে পীতাম্বরদাদা! কানে কি ভুল শুনলুম আমি! বাহান্ন টাকা! মোটে বাহান্ন টাকায় তোমাদের মতো রুস্তম আজকাল হাত নোংরা করছে! এ যে ঘোর কলিকাল পড়ে গেল গো! এতে যে আমারও বেজায় অপমান হয়ে গেল! মাত্র বাহান্ন টাকায় আমার গায়ে হাত তুললে তোমরা!"

পীতাম্বর একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে, "বেশি বুকনি দিলে মুখ তুবড়ে দেব বলছি!"

কালু বলে ওঠে, "উঁহু উঁহু, আর নয়। টাকা উশুল হয়ে এখন কিন্তু বেজায় লোকন যাচ্ছে আমাদের।"

পীতাম্বর সঙ্গে-সঙ্গে নরম হয়ে বলে, “তা বটে, ওরে কালী, বাহান্ন টাকার কথা তুলে আর আঁতে ঘা দিস না। ওই হাড়কেপ্পনটার সঙ্গে দরাদরিতে যাওয়াই ভুল হয়েছে। এখন সুদে-আসলে লোকসানটা তুলতে হবে।”

কালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সে আর তোমরা পারবে না। সকলের চোখের সামনে দুশো এগারোখানা মোহর যে-মানুষ হাতিয়ে নিতে পারে, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা তোমাদের মতো ভালমানুষদের কর্ম নয়। আর এ-গাঁয়ের লোকগুলোও সব চোখে ঠুলি-আঁটা ঘানির বলদ। খুন করে লাশটা কোথায় গুম করল সেটা অবধি খুঁজে দেখল না। ছোঁকরার আত্মাটা এই সন্ধেবেলাতেও এসে কত কাঁদাকাটা করে গেছে। একটু আগেই তো তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তোমরা এসে হুজ্জত শুরু করায় ভয় খেয়ে তফাত হয়েছে। আমার আধসের দুধ আর কয়েকখানা ইট বড় করে দেখলে পীতাম্বরদাদা, কালুভাই! ওদিকে যে পুকুরচুরি হয়ে গেল, সে-খবর রাখলে না! লোকটা কত বড় পিচাশ একবার ভেবে দ্যাখো, দুশো এগারোখানা মোহর টাকে গুঁজেও যে মাত্র বাহান্ন টাকায় তোমাদের কেনা গোলাম করে রাখতে চাইছে! আর শুধু কী তাই, ওই দ্যাখো, তোমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য লক্ষ্মণ পাইককে পাঠিয়েছে! ওই যে, বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে!”

পীতাম্বর আর কালু চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াতেই বাবলাতলা থেকে লক্ষ্মণ বেরিয়ে এসে পীতাম্বরের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, “অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম যে, তুমিই সেই লোক! আর লুকোছাপা করে লাভ নেই বাপু! আমি আবছা আলোতেও ঠিক বুঝতে পেরেছি, তোমার দুটো হাতই বাঁ হাত।”

পীতাম্বর একথায় এমন অবাক হয়ে গেল যে, তার মুখে কথা জোগাল না। খানিকক্ষণ লাগল সামলে উঠতে। তারপর বাঘা গলায় বলল, “কী বললি রে হনুমান?”

লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্র ভয় না খেয়ে একটু হেসেই বলল, “সারাদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক। রাম বিশ্বাসের কথা কি মিথ্যে হওয়ার যো আছে! দুটো বাঁ-হাতওলা লোক থাকতেই হবে!”

পীতাম্বর নিজের হাত দুখানা চোখের সামনে তুলে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলে, "কোথায় রে দুটো বাঁ হাত! আর থাকলে আমি তা এতদিনে টের পেতুম না! আচ্ছা বেল্লিক তো তুই দেখছি!

আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসে এখন আবোলতাবোল বলে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছিস হতভাগা! দেখাচ্ছি মজা।"

দুহাতে বজ্রমুষ্টি পাকিয়ে পীতাম্বর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করতেই কালু তার হাত চেপে ধরে বলল, "কত লোকসান যাচ্ছে খেয়াল করেছিস? এখন কিল-চড় খরচা করলে তার দামটা দেবে কে? বাহান্ন টাকার একটি পয়সাও কি বেশি আদায় হবে?"

"তা বটে!" বলে পীতাম্বর বন্ধ করা মুঠি খুলে, দমটা ছেড়ে ক্লান্ত গলায় বলে, "গাড়লটা বলছে কিনা আমার দুটোই বাঁ হাত! সেই জন্ম থেকে বাঁ-ডান দুই হাত নিয়ে বাস করে এলুম, হঠাৎ রাতারাতি জলজ্যান্ত হাতটা বদলে যাবে! এই যে ভাল করে দেখে নে আহাম্মক, ডান বা জ্ঞান যদি থেকে থাকে, তবে ভাল করে পরখ করে নে। তোর কপালের খুব জোর, এই দুটো হাতের ঘুসো তোকে খেতে হয়নি। নইলে..."

পীতাম্বরের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ লাঠি হাতে একটা লম্বা সিঁড়িঙ্গে মূর্তি বাবলাবনের শুড়িপথটা দিয়ে ধেয়ে এল, "মারবে মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ? এ কি মগের মুলুক? আমার রাজসাক্ষী মারলে অত বড় বাটপাড়ি আর খুনের কিনারা করবে কে?"

বলতে বলতেই গৌরগোবিন্দ হাতের মজবুত লাঠিটা তুলে পটাং-পটাং করে পেটাতে লাগলেন। পীতাম্বর আর কালু বহুঁকাল কারও হাতে মার-টার খায়নি। সবাই তাদের সমঝে চলে, কেউ গায়ে হাত তুলবার সাহসই পায় না। ফলে তারা এত অবাক হয়ে গেল যে, নিজেদের বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করতে পারল না। উপরন্তু মার না খেয়ে-খেয়ে এমন অনভ্যাস হয়ে গেছে যে, দুজনেই প্রথম চোটের লাঠির বাড়িটা খেয়েই 'বাবা রে' বলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি দিতে লাগল।

"বলি ও কালী, তুই ভাল আছিস তো বাপ! চোট-টোট লাগেনি তো! কোথায় পালালি বাবা? ভয় নেই রে, গুণ্ডা দুটোকে দিয়েছি ঠাণ্ডা করে। ওই দ্যাখ, কেমন চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে।"

ঠিক এই সময়ে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, "এই বয়সেও বেশ ভাল হাত আপনার। লাঠিখানা বেশ গুছিয়ে ধরেছিলেন বটে। ঠিক এরকমটা দেখা যায় না।"

গৌরগোবিন্দ তেড়ে উঠলেন, "বয়সটা আবার কোথায় দেখলে হে। কিসের বয়স? বয়সের কথা ওঠেই বা কেন? আর লাঠি ধরারই বা কী নতুন কায়দা দেখলে? চিরকাল লাঠিহাতে ঘুরে বেড়ালুম!"

"আজ্ঞে, তা বটে। কিন্তু যার দুটো হাতই বাঁ হাত, তার পক্ষে ওভাবে জুতসই করে বাগিয়ে ধরে লাঠি চালানো তো বড় সোজা কথা নয় কি না!"

গৌরগোবিন্দ একটু ঝুঁকে লোকটাকে ঠাহর করে নিয়ে বললেন, "অ, তুমি গগন সাঁপুইয়ের সেই পাইক লক্ষ্মণ বুঝি! সকাল থেকে বাঁ হাতের ফেরে পড়ে আছ দেখছি! তা কালীর ঠেক-এ তোমার আবার কী দরকার? অ্যাঁ! সাক্ষী গুম করতে এসেছ? দেখাচ্ছি মজা, দাঁড়াও..."

হঠাৎ করে লাঠির একখানা ঘা ঘাড়ে পড়তেই লক্ষ্মণ আর কালবিলম্ব করে চোঁচা দৌড় লাগাল।

"ও কালী, তুই কোথায় বাবা?"

কালী অবশ্য গৌরগোবিন্দর ডাক শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা তার নয়।

ঘটনাটা হল, কাল আর পীতাম্বর এসে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলায় কালী একটু গা-ঢাকা দিতে চেয়েছিল। মোহর আর খুনের ঘটনাটা এদের কাছে প্রকাশ করে ফেললে গগনের কাছ থেকে আর কিছু আদায়ের আশা নেই। কথাটা একটু প্রকাশ হয়েছে, ভাল। বাকিটুকু চাপা থাকলে গগনের ওপর একটা চাপ হয়। তাতে আদায় উশুলের সুবিধা। নইলে গুণ্ডা দুটো সব গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে আগেভাগে গিয়ে গগনের ট্যাঁক ফাঁক করতে লেগে যাবে। বরাতজোরে একটুও সুবিধাও হয়ে গেল কালীর। গৌর ঠাকুরদা এসে গুণ্ডা দুটোকে ঘায়েল করেছে। কালী: এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পেছনের কাঁটাবন দিয়ে সটকে সটান গগনের বাড়ি গিয়ে উঠবার তাল করেছিল।

কিন্তু কাঁটাবনে ঢুকতেই, ওরে বাপ! সামনেই ঘন কাঁটাবনে দুটো পেল্লায় চেহারার আবছা মূর্তি দাঁড়িয়ে! তারা অবশ্য কালী কাপালিককে গ্রাহ্যও করছিল না। কী একটা ব্যাপার নিয়ে দুজনের একটা রাগারাগি তকাতর্কি হচ্ছে। অন্ধকার কালীর চোখ-সওয়া, যেটা তার পিলে চমকে দিল তা হল লোক দুটোর পোশাক। জরিটরি দেওয়া পোশাক পরনে, মাথায় আবার মুকুটগোছের কী যেন আছে, গলায় মুক্তোমালার মতো মালা, হাতে আবার বালা-টালাও দেখা যাচ্ছে। যাত্রাদলে যেমন দেখা যায় আর কি! কিন্তু এ-গাঁয়ে বা আশেপাশে কোথাও এখন কোনও যাত্রাপালা হওয়ার কথা নেই। এরা এল কোত্থেকে?

কালী সুট করে গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল। লম্বা-চওড়া আর বেশি ঝলমলে পোশাক-পরা লোকটা বলছে, "তুমি অত্যন্ত বেয়াদব এবং বিশ্বাসঘাতক। যেভাবে তুমি আমাকে পাতালঘরে টেনে নামিয়ে পেছন থেকে ছোরা বসিয়েছিলে তা কাপুরুষ এবং নরাধমরাই একমাত্র পারে।"

অন্য লোকটা একটু নরম গলায় বলে, "মহারাজ আপনাকে না মারলে যে আমাকেই মরতে হত। আপনার মতলবটা তো আমি আগেই আঁচ করেছিলাম কি না। আত্মরক্ষার জন্য খুন করা শাস্ত্রে অপরাধ নয়।"

"কিন্তু রাজ-হত্যার মানে কী জানো চন্দ্রকুমার? রাজা হচ্ছে পিতার সমান। তাকে হত্যা করে তুমি পিতৃঘ্ন হয়েছ। তুমি চিরকাল আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছ, আমার নুন খেয়েছ, রাজসভায় যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছ আমারই বদান্যতায়। তার প্রতিদান কি এই? তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম এটাই বা কে বলল? তোমাকে পাতালঘরে নেমে দেখাতে চেয়েছিলাম সুড়ঙ্গগুলো কীরকম।"

"আজ্ঞে না, মহারাজ। মোহরের হদিস যখনই আপনি আমাকে দিয়ে দিলেন, তখনই বুঝলুম যে, আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়। তাই আমি সঙ্গে গোপনে একখানা ধারালো ছোরা রাখতুম। যেদিন আপনি নিজে সঙ্গে করে মহা সমাদরে আমাকে পাতালঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন, সেদিনই আমি ঠিক করেছিলুম, যদি নামি আপনাকে নিয়েই নামব। প্রাসাদে গর্ভগৃহে নামবার গুপ্ত সিঁড়িতে আপনি আমাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে ভারী দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে আপনাকে টেনে নামিয়ে এনে ষড়যন্ত্রটা ওখানেই শেষ করে দিই।"

"তুমি বোধ হয় ধরাও পড়োনি?"

"আজ্ঞে না, মহারাজ। আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আপনি হঠাৎ বৈরাগ্যবশত নিরুদ্দেশ হয়েছেন এটাই রটনা হয়েছিল। তবে আমি নিমকহারাম নই। গুপ্তধনের হদিসসহ পুঁথিখানা আমি আপনার পুত্র বিজয়প্রতাপকে হস্তান্তর করেছিলাম। আমি নিজে কিন্তু গুপ্তধন হরণের চেষ্টা করিনি।"

মহারাজ দাঁত কড়মড় করে বললেন, "করলেও লাভ হত না। আমি নিজে যখ হয়ে দেড়শো বছর মোহরের কলসিতে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে ছিলুম। মাঝে-মাঝে যে বেরিয়ে এসে তোমার ঘাড় মটকাতে ইচ্ছে করত না, তা নয়। কিন্তু মোহরগুলো এমন চুম্বকের মতো আমাকে আটকে রেখেছিল যে, বেরোবার সাধ্যই হয়নি।"

চন্দ্রকুমার একটু যেন মিচকে হাসি হেসে বললেন, “আজ্ঞে সেটা আমি জানতুম। আপনার পক্ষে ওই মোহর ছেড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল বলেই আমি নিশ্চিন্তমনে নিরানব্বই বছর অবধি বেঁচে হেসেখেলে আয়ুষ্কালটা কাটিয়ে গেছি। মোহরের মোহ ছিল না বলেই পেরেছি।”

মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমার পুত্র বা পৌত্ররাও তো কেউ গুপ্তধনের খোঁজ করেনি!”

“না মহারাজ। তারা ও-পুঁথি উলটেও দেখেনি। দেখলেও সঙ্কেত উদ্ধার করতে পারত না। আমার জীবিতকালেই ও-পুঁথি নিরুদ্দেশ হয়। তাতে আমি বেঁচেছি আর আপনিও নিরুদ্বেগে দেড়শো বছর মোহরের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরেছেন।”

“কথাটা সত্যি। মোহর অতি আশ্চর্য জিনিস। তার মধ্যে ডুবে থেকে কখন যে দেড়শোটা বছর কেটে গেল তা টেরই পেলাম না। বেরিয়ে এসেই আমি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি কাল থেকে।”

“জানি মহারাজ। আপনার ভয়েই আমি কাল থেকে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। শেষে এই নিরিবিলি কাঁটাবনে এসে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করেছিলাম। হাতে একটা জরুরি কাজ ছিল, নইলে আমি অনেক দূরে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতাম।”

মহারাজ যেন কিছুটা নরম হয়ে বললেন, “শোনো চন্দ্রকুমার, আমার মনে হচ্ছে তোমার প্রতি আমি একটু অবিচারই করে ফেলেছি। এতদিন পরে আমি আর সেই পুরনো রাগ পুষে রাখতে চাই না। বরং তোমার সাহায্যই আমার প্রয়োজন। তুমি পণ্ডিত মানুষ, বলতে পারো, দেড়শো বছর ধরে আমার মোহর আগলে রাখার প্রয়াস এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল কেন?”

“ব্যর্থ হবে কেন মহারাজ?”

মহারাজ রাজকীয় কণ্ঠে হুঙ্কার করে উঠলেন, "আলবাত হয়েছে। কোথাকার কে একটা অজ্ঞাতকুলশীল এসে আমাকে সুদু মোহরের ঘড়া। গর্ভগৃহ থেকে টেনে বের করে আনল, আমি তাকে বৃশ্চিক হয়ে দংশন করলাম, সাপ হয়ে হুমকি দিলাম, কিস্তৃত মূর্তি ধরে নাচানাচি করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তা হলে কি যক্ষ হয়ে নিজস্ব ধনসম্পত্তি পাহারা দেওয়ার কোনও দামই নেই?"

"অবশ্যই আছে মহারাজ। কোনও অনধিকারী ওই কলসি উদ্ধার করতে গেলে আপনার প্রক্রিয়ায় কাজ হত। কিন্তু অধিকারী যদি উদ্ধার করে তা হলে যখের কিছুই করার থাকে না।"

রাজা আবার ধমকে উঠলেন, "কে অধিকারী? ওই ছোঁকরাটা?"

"অবশ্যই মহারাজ, সে আপনার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।"

মহারাজ অতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "বলো কী হে চন্দ্রকুমার?"

"আপনার বংশতালিকা আমার তেরিই আছে। আপনার পুত্র বিজয়প্রতাপ, তস্য পুত্র রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র নরেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র তপেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র রবীন্দ্রপ্রতাপ, এবং তস্য পুত্র এই ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ। ইন্দ্রজিৎ ও তস্য পিতা অবশ্য ম্লেচ্ছদেশে বসবাস করেন। বিলেতে।"

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ একটু উদ্বেগের গলায় বললেন, "কিন্তু আমার এই উত্তরপুরুষেরা ওইসব মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য মোহরের কদর বুঝবে তো! রক্ষা করতে পারবে তো!"

চন্দ্রকুমার একটু চিন্তিত গলায় বললেন, "সেটা বলা কঠিন। আপনার উত্তরপুরুষেরা যদি মোহর নয়ছয় বা অপব্যবহার করে, তা হলেও আপনার আর কিছুই করার নেই। মোহরের কথা ভুলে যান মহারাজ।"

মহারাজ আর্তনাদ করে উঠলেন, "বলো কী হে চন্দ্রকুমার! কত কষ্ট করে, কত অধ্যবসায়ে, কত ধৈর্যে,কত অর্থব্যয়ে আমি সারা পৃথিবী থেকে মোহর সংগ্রহ করেছি। ওই মোহরের জন্য তোমার হাতে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছি। পর-পর দেড়শো বছর যখ হয়ে মোহর পাহারা দিয়েছি, এসব করেছি কি মোহরের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য?"

"মহারাজ, মোহরের মধ্যে মোহ শব্দটাও লক্ষ করবেন। এই মোহে পড়ে আপনি যথোপযুক্ত প্রজানুরঞ্জন করেননি, বহু নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ করেছেন, আমাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ওই মোহরের মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত আছে? আপনার উত্তরপুরুষ যা খুশি করুক, আপনি চোখ বুজে থাকুন।"

মহারাজ হাহাকার করে উঠে বললেন, "তোমার কথায় যে আমার আবার মরে যেতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রকুমার! মরার আগে তোমাকেও হত্যা করতে ইচ্ছে করছে! আমার মোহর... আমার মোহর..."

ঠিক এই সময়ে কালী কাপালিক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রক্তাম্বরের খুঁটে দুটি চোখ মুছে নিয়ে বলল, "আহা, এ-জায়গাটায় যা পার্ট করলেন মশাই, চোখের জল রাখতে পারলুম না। পালাটিও বেঁধেছেন ভারী চমৎকার। কোন অপেরা বলুন তো! কবে নাগাদ নামছে পালাটা?"

দুই ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে কালীর দিয়ে চেয়ে রইল। কালী বিগলিত মুখে বলে, "আমিও এককালে পার্ট-টার্ট করতুম। অনেকদিন আর সাধন-ভজনে মেতে গিয়ে ওসব হয়নি। তা এ যা পালা দেখছি, একটা কাপালিকের পার্ট অনায়াসে ঢোকানো যায়। আর আমাকে তো দেখছেন, মেকআপও নিতে হবে না। আড়াল থেকে শুনছিলুম মশাই, তখনই ভেবে ফেললুম এ-পালায় যদি একখানা চান্স পাই তা হলে কাপালিকের কেরামতি দেখিয়ে দেব। কিন্তু বড্ড হালফিলের ঘটনা মশাই, এত তাড়াতাড়ি পালাটা বাঁধল কে?"

মহারাজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "চন্দ্রকুমার এ-লোকটা কে?"

“এ এক ভ্রষ্টাচারী, মহারাজ। কাপালিক সেজে থাকে।”

হঠাৎ দুই বিকট ছায়ামূর্তি ভোজবাজির মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল।

কালীর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল লহমায়। চোখের সামনে যা দেখল, নিজের কানে যা শুনল তা কি তা হলে যাত্রার পালা নয়? কাঁটাবনে ঢুকে যাত্রার মহড়া দেওয়াটাও তো কেমন-কেমন ঠেকছে যেন! আর ঘটনাটা! বাপ রে!

কালী বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, “ভূঃ...ভূঃ...ভূঃ...ভূঃ..”

ঠিক এই সময়ে বাজারের দিকটাতেও একটা শোরগোল উঠল, “চোর! চোর! ”

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, “এই তো! এই তো সেই কাল রাতের চোরটা! গগন সাঁপুইয়ের বাড়িতে ধরা পড়েছিল! আজ আবার ভোল পালটে কার সর্বনাশ করতে ঘুরঘুর করছিল!”

চোরের বৃত্তান্ত শুনে চণ্ডীমণ্ডপের আসর ভেঙে মাতব্বররাও ছুটে এলেন। শিমুলগড়ের মতো ঠাণ্ডা জায়গায় কী উৎপাতই না শুরু হয়েছে! তবে, এসব কিছু হলে পরে সময়টা কাটে ভাল।

চোর শুনে গৌরগোবিন্দও লাঠি হাতে দৌড়ে এলেন। অত্যন্ত রাগের গলায় বলতে লাগলেন, “এ কি গগনের চোরটা নাকি? তার তো খুন হওয়ার কথা! কোন আকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এরকম হলে তো বড়ই মুশকিল। একবার খুন হয়ে গেলে ফের আবার ধরা পড়ে কোন আহাম্মক! সব হিসাব আমার গণ্ডগোল হয়ে গেল দেখছি!”

নটবর ঘোষ চাপা গলায় বলে, “খুব জমে গেছে কিন্তু ঠাকুরদা।”

৬. রাত্রিবেলাটাই ভয়ের সময়

রাত্রিবেলাটাই ভয়ের সময়। ঘরে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টাকার মোহর। গগন সাঁপুইয়ের টাকা আছে বটে, কিন্তু এত টাকার কথা সে জীবটেও ভাবতে পারেনি। ভগবান যখন দিলেন, তখন এ-টাকাটা ঘরে রাখতে পারলে হয়। চারদিকে চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি, বাটপাড়িতে কলির ভরা একেবারে ভরভরন্ত। হরিপদ বিদায় হওয়ার পরই ঘরে ডবল তালা লাগিয়ে চাবি কোমরে গুঁজে গগন বেরোল নিজের বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখতে।

নাঃ, উঁচু দেওয়াল থাকলে কী হয়, এ-দেওয়াল টপকানো কঠিন কাজ নয়। দুটো কুকুর আছে বটে, কিন্তু জানোয়ার আর কতটাই বা কী করতে পারে! পাইক আর কাজের লোকজন আছে বটে, কিন্তু লোকবলটা মোটেই যথেষ্ট নয়। ডাকাত যদি পড়ে তবে মহড়া নেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই। দরজা-জানলা খুবই মজবুত কিন্তু অভেদ্য নয়। বড়জোর দুর্ভেদ্য বলা যায়। শালবল্লা দিয়ে গুঁতো মারলেই মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক আছে, কিন্তু ডাকাতরা যদি সাত-আটটা বন্দুক নিয়ে আসে, তা হলে? নাঃ, বাড়ির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মোটেই খুশি হল না গগন। দিনের আলো ফুরোবার আগেই আরও পাকা ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়িতে যত লাঠি, দা, কুড়ুল, কাটারি, টাঙি, ট্যাটা, বল্লম, সড়কি, ছোরাছুরি ছিল, গগন সব বের করে জড়ো করল দাওয়ায়। বাড়ির লোককে ডেকে বলল, "ডাকাত পড়ার কথা আছে। সবাই খুব সাবধান। প্রত্যেকেই অস্ত্র রাখবে হাতে।"

তিন ছেলের দু'জন বন্দুক হাতে সন্ধে থেকেই মোতায়েন রইল দাওয়ায়। পাইক আর কাজের লোকজনদেরও সজাগ করে দেওয়া হল। একজন কাজের লোক তীর-ধনুক নিয়ে ঘরের চালে উঠে বসে রইল।

গগন ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল এঁটে মোহরের থলিটা বের করে গুণে দেখল। নাঃ, দুশো এগারোখানাই আছে। তারপর দরজায় তিন ডবল তালা লাগিয়ে এক হাতে

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

রাম-দা অন্য হাতে বল্লম নিয়ে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। তবু ব্যবস্থাটা তার মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। পাশেই নারায়ণপুর গাঁয়ে কয়েক ঘর লেঠেল চাষি বাস করে। কাল সকালেই তাদের কয়েকজনকে আনিয়ে নিতে হবে।

ঘরের চাল থেকে হঠাৎ ধনুকধারী কাজের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "ওই আসছে!"

গগন একটা লাফ দিয়ে উঠল, "কে! কে আসছে রে? কার আবার মরার সাধ হল? কোন নরাধম এগিয়ে আসছিস মৃত্যুমুখে? আজ যদি তোর মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া না খেলি তো আমার নাম গগনই নয়.."

বলতে বলতে গগন ছুটে সদর দরজার বাইরে গিয়ে রাম-দা ঘোরাতে-ঘোরাতে চেঁচিয়ে উঠল, "আয়! আয়! আজই কীচক বধ হয়ে যাক।"

যে-লোকটা সদর দরজার কাছ বরাবর চলে এসেছিল, সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রক্ষে করুন কাবাবু! আমি লক্ষ্মণ।"

গগন উদ্যত রাম-দা নামিয়ে বলল, "লক্ষ্মণ, তুই কোথা থেকে?"

"আজ্ঞে, একটু খবর আছে। ভাল খবর। চোরটা ধরা পড়েছে।"

গগন হকচকিয়ে গিয়ে বলে, "ধরা পড়েছে মানে! তার তো ধরা পড়ার কথা নয়।"

লক্ষ্মণ নিজের ঘাড়ে হত বোলাতে-বোলাতে বলে, "ছেড়ে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল কাবাবু। চোরের স্বভাব যাবে কোথায়! কু-মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল, গাঁয়ের লোকেরা ধরে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে গেছে। লোক জড়ো হয়েছে মেলা।"

গগন বিরক্ত হয়ে বলে, "আচ্ছা আহাম্মক তো! ছেড়ে দিয়েছি; চলে যা। ফের ঘোরাফেরা করতে এল কেন?"

"আজ্ঞে, মোহর-টোহর নিয়ে কীসব কথাও হচ্ছে যেন। আমার ঘাড়ে বড় চোট হয়েছে বলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ঘাড়ে মালিশ করতে হবে।"

মোহর নিয়ে কথা! গগনের বুকটা একটু দুলে উঠল। সে ভেবে নিয়েছিল, ছোঁকরা কোথা থেকে চুরি করে মোহর নিয়ে পালাচ্ছিল। বেকায়দায় তার বাড়িতে ঢুকে ধরা পড়ে যায়। যে পরিমাণে ভয় খেয়ে গিয়েছিল তাতে তার এ-তল্লাটে থাকার কথাই নয়। যদিও চোরের কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না, তবু কথাটা পাঁচকান হওয়া ভাল নয়। ভগবান যখন ছপ্পর ছুঁড়ে দিলেনই এখন ভালয়-ভালয় শেষরক্ষা হলে হয়।

ভগবানকে ডাকতে-না-ডাকতেই ঘরের চাল থেকে কাজের লোকটা আবার চেঁচাল, "ওই আসছে!"

"কে! কে! কোন ডাকাত! কোন গুণ্ডা! কোন বদমাশ.." সদর দরজার বাইরে দুই বিশাল চেহারার লোক এসে দাঁড়াল।

তাদের একজন অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কাজটা কি ভাল করলেন গগনবাবু?"

গগন উদ্যত বল্লমখানা নামিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে, "পীতাম্বর নাকি রে?"

পীতাম্বর অত্যন্ত করুণ গলায় বলে, "সবাই যে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ করছে গগনবাবু! আমাদের মান-ইজ্জত যে আর রাখলেন না আপনি! এমনকী কালী কাপালিক অবধি নাক সিঁটকে বলল, "মাত্র বাহান্ন টাকায় আমার গায়ে হাত তুললে তোমরা! যার ঘরে দুশো এগারোখানা মোহর,সে মাত্র বাহান্ন টাকায় তোমাদের মতো রুস্তমকে কিনে নিল! এখন আপনিই বলুন গগনবাবু, আপনার জন্য কীরকম অপমানিত হতে হল আমাদের!"

চোখ কপালে তুলে গগন বলে, "মোহর! অ্যাঁ! মোহর! তাও আবার দুশো এগারোখানা! কালীর এই গল্প বিশ্বাস করে এলি তোরা? কালী দশটা কথা বললে তার মধ্যে এগারোটা

মিথ্যে কথা থাকে! মোহর আমি জন্মেও দেখিনি রে ভাই, কেমন দেখতে হয় তাই জানি না। গোল না চৌকো, তেকোনা না চারকোনা কে জানে বাবা!"

পীতাম্বর গম্ভীরতর গলায় বলে, "সেটা মিথ্যে না সত্যি তা জানি না। তবে বাহান্ন টাকাটা তো আর মিথ্যে নয়। বড্ড শস্তার দরে ফেলে দিলেন আমাদের। জাতও গেল, পেটও ভরল না। সবাই জানল, কালু আর পীতাম্বর আজকাল ছিচকে কাজ করে বেড়ায়। কেউ পুঁছবে আর আমাদের?"

গগন গদগদ হয়ে বলল, "আয় রে ভাই, ভেতরে আয়। লোকসান যা হয়েছে পুষিয়ে দিচ্ছি। মানীর মান দিতে আমি জানি রে ভাই। আয়, আয়, পেছনের উঠোনে নিরিবিলিতে গিয়ে একটু কথা কই।"

পেছনের উঠোনে দুটো মোড়ায় দুজনকে সমাদর করে বসিয়ে গগন একটু হেঁ-হেঁ করে নিয়ে বলে, "কত চাই তোদের বল তো!"

পীতাম্বর আর কালু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিয়ে আর-একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পীতাম্বর গলাখাকারি দিয়ে বলে, "যে কাজে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তার দরুন দুটি হাজার টাকা আমাদের পাওনা হয়। আপনি বোধ হয় মানুষকে ওষুধ করতে পারেন, নইলে বাহান্ন টাকায় ৮০

রাজি হওয়ার বান্দা আমরা নই। যখন আপনার সঙ্গে দরাদরি হচ্ছিল তখন আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল মশাই।"

গগন অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু তুই যে নিজে মুখেই দেড়শো টাকা চেয়েছিলি ভাই।"

"সেও ওই ওষুধের গুণে। আমাদের ন্যায্য দর দু হাজার।"

গগন একটু বিগলিত হেসে বলে, "তাই পাবি রে, তাই পাবি। তবে আর-একটা ছোটখাটো কাজও করে দিতে হবে যে ওস্তাদ। তার দরুন আলাদা চুক্তি।"

"কাজ! আজ যে আমাদের দম ফুরিয়ে গেছে গগনবাবু। আপনারই আহাম্মকি। কালী কাপালিকের যে লাঠিয়াল আছে সেকথাটা আগে বলতে হয়। আমরা তৈরি থাকলে ব্যাটার চোদ্দপুরুষের সাধ্যি ছিল না

অমন বেমক্কা লাঠিবাজি করে যায়। আচমকা যেন মাটি খুঁড়ে উঠে এসে পটাং-পটাং করে এমন ঘাকতক চোখের পলকে বসিয়ে দিল যে, মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে, কাঁধের হাড়েও চোট।"

গগন অবাক হয়ে বলে, "কালীর লাঠিয়াল! এ যে নটে শাকের ক্যাশমেমোর কথা বলছিস! পায়জামার কি বুক পকেট হয় রে? ইঁদুরের কি কখনও শুড় হয় দেখেছিস? না কি খরগোশের শিং!"

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "সে আমরা বলতে পারব না। তবে সিঁড়িঙ্গে লম্বা একটা লোক ইয়া বড় লাঠি নিয়ে এসে আমাদের ওপর খুব হামলা করেছে মশাই। অবিশ্যি আমাদের হাতে পার পাবে না। গায়ের ব্যথাটা মজলেই আমরা তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যাব। তবে আজ আর কাজের কথা বলবেন না। টাকাটা ফেলে দিন। বাড়ি যাই।"

গগন গনগনে মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তোরা দুটোই পুরুষের সমাজে কুলাঙ্গার। মস্তানি করতে গিয়ে লাঠি খেয়ে এসেছিস, তোদের ধুতির কাছা খুলে ঘোমটা দেওয়া উচিত। তার ওপর টাকা চাইছিস! দেব পাঁচ গাঁয়ে রটিয়ে তোদের এই কলঙ্কের কথা? ভাল চাস তো কাজটা উদ্ধার করে দে। নইলে দেব কিন্তু ট্যাড়া পিটিয়ে।"

পীতাম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "আপনি খুব নটঘটে লোক মশাই। তা কাজটা কী? টাকা কত?"

"কাল রাতে একটা চোর ধরা পড়েছিল আমার বাড়িতে। সর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল। তো তাকে ধরেও মায়া করে ছেড়ে দিই। শুনলুম সে নাকি এখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে এ-গাঁয়ের

আমার শত্তুরদের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই। খেটেখুটে দুটো পয়সা করব তার কি জো আছে? অমনই লোকের চোখ টাটাবে। তার ওপর ছোঁড়া আমার ঘরে ঢুকে সব খোঁজখবর নিয়ে গেছে। এখন কী করে তার ঠিক নেই। গাঁয়ের লোককেও হাত করল, তারপর গিয়ে ডাকাতের দলে খবর দিল, যা হোক, একটা কিছু লোকসান সে আমার করবেই। এখন ভাবছি, বেঘোরে আমার প্রাণটাই যায় কি না। তা বাবা, এ-ছোঁকরাটার একটা ব্যবস্থা তোদের করতেই হবে। জখম-হওয়া সাপ বা বাঘের শেষ রাখতে নেই।"

"খুনের মামলা নাকি মশাই?"

"সে তোরা যা ভাল বুঝবি করবি। পাপমুখে কথাটা উচ্চারণ করি কী করে? তবে তার মুখ চিরকালের মতো বন্ধ না করলেই নয়। দরাদরি করব না ভাই, আগের দু হাজার আর থোক আরও পাঁচ হাজার টাকা পাবি। কিন্তু আজই কাজটা উদ্ধার করতে হবে। এখনই।"

কাল কুট করে একটা চিমটি কাটল পীতাম্বরকে। পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "আমাদের মানমর্যাদার কথাটা কি ভুলে গেলেন! তার ওপর সদ্য লাঠি খেয়ে এসেছি। গায়ের ব্যথাটাও মরেনি। খুনের বাবদ মোট দশটি হাজার টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন গিয়ে। রাজি থাকলে চিড়ে-দই আনতে বলে দিন তাড়াতাড়ি। আমাদের আবার অনেকটা পথ যেতে হবে। ঘরে আগুন দেওয়ার আরও একটা কাজ রয়েছে হাতে। আর পুরো টাকাটাই আগাম ফেলুন।"

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আজ যে আমার ঘরের মা-লক্ষ্মীর বেরিয়ে যাওয়ারই দিন। তাই হবে বাপ, যা চাচ্ছিস তাই দেব। কিন্তু চিড়ে-দুই কি আর সহ্য হবে? একটু আগেই তো খেয়ে গেলি! উপযুপরি খাওয়া কি ভাল! বদহজম হয়ে শেষে কাজ গুবলেট করে দিবি না তো! জিনিস না হয় অন্যের, কিন্তু নৌকো তো তোর নিজের, নাকি রে? তা যা ভাল বুঝবি করবি।"

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "চিড়ে-দই না হলে আমরা কাজে হাতই দিই না। প্রত্যেক কাজের আগে চিড়ে- দই।"

তাই হল। আবার সাপটে চিড়ে-দই খেয়ে বারো হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে কালু আর পীতাম্বর 'দুগা দুর্গতিনাশিনী' বলে রওনা হয়ে পড়ল।

গগন আর দেরি করল না। সদর দরজা এঁটে একটা পুরনো ভাঙা ঢেঁকিগাছ ধরাধরি করে এনে দরজায় ঠেকনো দিল। তার ওপর একটা উদ্‌খল চাপাল। বাড়ির মেয়েদের হুড়ো দিয়ে রাতের খাওয়া আগেভাগে সারিয়ে নিল। সবাইকে সজাগ থাকতে বলে নিজে মোহরের ঘরে ঢুকে দরজা ভাল করে এঁটে একটা ভারী আলমারি দিয়ে দরজা চেপে দিল। রাম-দা আর বল্লম হাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। মাঝে-মধ্যে অবশ্য মোহর বের করে গুনে দেখছিল সে। নাঃ, দুশো এগারোখানাই আছে। কাগজ কলম নিয়ে লক্ষলক্ষর সঙ্গে দুশো এগারো গুণ দিয়ে দেখল, কোটি-কোটিই হয়। টাকাটা ভগবান বড্ড বেশিই দিয়ে ফেলেছেন। তা না হবে কেন, গগন তো লোক খারাপ নয়। সেই গেল বছর একটা কানা ভিখিরিকে পুরনো কেলে কম্বলটা দেয়নি সে? চার বছর আগে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একঘটি খাঁটি মোষের দুধ ঢেলে আসেনি সে? আরও আছে। গগনের মুনিষ প্যালারাম খেতের কাজে বেগার খাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা গেলে তার বউ যখন এসে কেঁদে পড়ল, তখন প্যালারামের তিনশো টাকা ঋণের ওপর যে ন'শো টাকা সুদ হয়েছিল, তার পাঁচটা টাকা সুদ থেকে কমিয়ে দেয়নি গগন? এই ভাল-ভাল কাজ করার পরও যদি ভগবান মুখ তুলে না চান, তবে আর দুনিয়াতে ধর্ম বলে কিছু থাকে নাকি?

রাত কি খুব গম্ভীর হয়ে গেল? চারদিকটা কেমন ছমছম করছে যেন! এখন হেমন্তের সময়, রাতে শিশির পড়ে। চারদিকটা এত ছমছম করছে যে, শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাইরে যারা পাহারায় আছে তারা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল? রাম-দাখানা দু-একবার ঘোরাল গগন। বল্লমখানা একটু লোফালুফি করে নিল। দুটোরই বেশ ওজন। হাত ব্যথা করছে। তা করুক। হাতে অস্ত্র থাকলে একটা বল-ভরসা হয়। মাঝে-মাঝে মোহর বের করে গুণে দেখছে গগন। নাঃ, দুশো এগারোখানাই আছে।

হঠাৎ গায়ে একটু কাঁটা দিল গগনের। ঘরে কি সে একা! আর কেউ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো! একটা শ্বাস ফেলার শব্দ হল যেন! গগন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চারদিকটা ভাল করে টর্চ জ্বেলে দেখে নিল। লুকোবার তেমন জায়গা নেই এ-ঘরে। তবু চৌকির তলা, বাক্স-প্যাটরা সরিয়ে দেখল, আলমারির পাশের ফাঁকে দেখল, পাটাতনে উঠেও দেখে নিল। কেউ নেই। ঘরে সে একাই বটে।

কিন্তু রাতটা যে বড্ড বেশি নিশুত হয়ে উঠল! এখনও তো ভাল করে নটাও বাজেনি! তা হলে এমন নিশুতরাতের মতো লাগছে কেন? বাড়ির কারও যে কাসি বা নাকডাকারও শব্দ হচ্ছে না! গগন ঘটি থেকে একটু জল মুখে দিল। গলাটা বড্ড শুকিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফিচিক করে একটা হাসির শব্দ হল না! গগন রাম-দাখানা ঝট করে তুলে বলল, "কে রে?"

অমনই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। গগন বাঘের মতো চারদিকটা হুটপাট করে দেখল। কেউ নেই। গগন একবার হাঁক মারল, "ওরে ভণ্টা! নিতাই! শম্ভু! তোরা সব জেগে আছিস তো!"

কেউ সাড়া দিল না। গগন লক্ষ করল, তার গলাটা কেমন কেঁপে-কেঁপে গেল, তেমন আওয়াজ বেরোল না। সে আবার জল খাওয়ার জন্য ঘটিটা তুলতেই কে যেন খুব চাপা স্বরে বলে উঠল, "কোথায় মোহর?"

ঘটিটা চলকে গেল। গগন ঘটি রেখে বিদ্বেগে রাম-দা তুলে প্রাণপণে বনবন করে ঘোরাতে লাগল, "কে? কার এমন বুকের পাটা যে, সিংহের গুহায় ঢুকেছিল? যদি মরদ হোস তো বেরিয়ে আয়! দু টুকরো করে কেটে ফেলব, যদি খবর্দার মোহরে নজর দিয়েছিস তো...!"

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস।

গগন ভারী খাঁড়াখানা আর ঘোরাতে পারছিল না। হাঁফ ধরে গেছে। দুর্বল হাত থেকে খাঁড়াখানা ঝনাত করে মেঝেয় পড়ে গেল, গগন পড়ল তার ওপর। ধারালো খাঁড়ায় ঘ্যাঁচ করে তার ডান হাঁটুর নীচে খানিকটা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। রক্তকে অবশ্য গ্রাহ্য করল না গগন। খাঁড়া টেনে তুলে ফের দাঁড়াল। দু চোখে খুনির দৃষ্টি।

খুব খুশখুশে গলায় কে যেন বলে উঠল, "আসছে!"

গগন ফের খাঁড়া মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলে উঠল, "কে আসছে রে পাষণ্ড? অ্যাঁ! কে আসে? মেরে ফেলে দেব কিন্তু! একদম খুন করে ফেলে দেব,মা কালীর দিব্যি?"

বলতে বলতে খাঁড়ার ভারে টাল সামলাতে না পেরে গগন গিয়ে সোজা দেওয়ালে ধাক্কা খেল। এবার খাঁড়ায় তার বাঁ হাতের কবজি অনেকটা ফাঁক হয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল।

ফের কে যেন ফ্যাসফেসে গলায় বলে, "ওই এল।"

গগন আর পারছে না। সে খাঁড়া ফেলে বল্লম দিয়ে চারদিকে হাওয়ায় খোঁচাতে লাগল। মেঝেয় নিজের রক্তে পিছলে গিয়ে সে ফের খাঁড়ায় হোঁচট খেল। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা প্রায় অর্ধেক নেমে গেল তার।

গগন কষ্টেসৃষ্টে ফের উঠল। এক হাতে খাঁড়া, অন্য হাতে বল্লম। কিন্তু তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেজায়। হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলল, "আয় দেখি, কে আসবি! আয় না! গদান চলে যাবে কিন্তু! বাইরে আমার লোক আছে। ডাকব কিন্তু! বন্দুক আছে, দেখাব? কুকুর আছে, এমন কামড়াবে যে.."

"কত মোহর!"

গগন ফের বনবন করে রাম-দা ঘোরাতে গেল।

৭. চণ্ডীমণ্ডপে আজ বেজায় গণ্ডগোল

চণ্ডীমণ্ডপে আজ বেজায় গণ্ডগোল, কাল রাতের চোরটা ফের আজ ধরা পড়েছে। বাজারে নটবর ঘোষের ভাই হলধর ঘোষের মিষ্টির দোকানে ঢুকে জল খেতে চেয়েছিল। তাতে কারও সন্দেহ হয়নি। জল খেয়ে হঠাৎ বলে বসেছে, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

চাষাভুষোর মুখে থ্যাঙ্ক ইউ' শুনেই হলধর ঘোষ উঠে ছোঁকরাকে ধরেছে, "কে রে তুই! সাতজন্মে কেউ কখনও চাষার মুখে ইংরেজি শুনেছে? তুই যে বড় ফটাস করে ইংরেজি ফোঁটালি! বলি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি? আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে স্কুল খোলর এই ফল হচ্ছে। বুঝি! অ্যাঁ!"

ছোঁকরার হাতখানা চেপে ধরেছিল হলধর, তা হাত থেকে খানিকটা ভুষো কালি উঠে এল তার হাতে। আর ছোঁকরার ফরসা রংটাও বেরিয়ে পড়ল একটুখানি। তখনই চেঁচামেচি।"চোর! চোর! সেই চোর!"

ছোঁকরা পালাতে পারল না। সঙ্গে একটা স্যাঙাত ছিল বাচ্চামতে। সে অবশ্য পালাল।

ছোঁকরাকে চণ্ডীমণ্ডপে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে কষে বাঁধা হয়েছে। মাতব্বররা সব জাঁকিয়ে বসেছেন।

নটবর ঘোষ গলা তুলে বলে, "চোরকে ছেড়ে দেওয়াটা গগনের মোটই উচিত কাজ হয়নি। ছেড়ে দিল বলেই তো ফের গাঁয়ে ঢুকে মতলব আঁটছিল।"

গৌরগোবিন্দ বললেন, "আহা এ তো অন্য চোরও হতে পারে বাপু! আমি তো শুনেছি কালকের চোরটা খুন হয়েছে।"

বিজয় মল্লিক বললেন, “না ঠাকুরদা, এ সেই চোর। আমরা সাক্ষী আছি। এর বুকের পাটা আছে বাপু। একবার ধরা পড়েও শিক্ষা হয়নি! ওরে ও ছোঁড়া, বলি পেছনে দলবল আছে নাকি? এত সাহস না হলে হয় কী করে তোর!”

খাঁদু বিশ্বাস বলল, “শিমুলগড়ে ফাল হয়ে ঢুকেছ, এবার যে উঁচ হয়ে বেরোতে হবে!”

হলধর হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “বেরোতে দিচ্ছে কে? এইখানেই মেরে পুঁতে ফেলব। আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে চোর-ডাকাত ধরা পড়লে পুলিশে দেওয়ারও রেওয়াজ নেই। মেরে পুঁতে ফেলছে সবাই। যাদের মন নরম তারা বরং বাড়ি গিয়ে হরিনাম করুন।”

নটবর বলে, “হলধর কথাটা খারাপ বলেনি। পুলিশে দিয়ে লাভ নেই। ওসব বন্দোবস্ত আছে। হাজত থেকে বেরিয়ে ফের দুষ্কর্মে লেগে পড়বে। আমাদের সকলের ঘরেই খুদকুঁড়ো সোনাদানা আছে। সর্বদা ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়।”

মাতব্বররা অনেকেই মাথা নেড়ে সায় দিল, “তা বটে।”

হরি গাঙ্গুলি বললেন, “সে যা হোক, কিছু একটা করতে হবে। তবে চোরের একটা বিচারও হওয়া দরকার। পাঁচজন মাতব্বর যখন আমরা আছি, একটা বিচার হয়ে যাক।”

প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল বলে উঠল, “কিন্তু সওয়াল-জবাব হবে কী করে! চোরটা যে বড্ড নেতিয়ে পড়েছে, দেখছ না! ঘাড় যে লটরপটর করছে!”

হলধর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “দুখানা পেল্লায় চড় কষালেই ফের খাড়া হয়ে যাবে ঘাড়। কালকেও তো এরকমই নেতিয়ে পড়ার ভান। করেছিল।”

হলধর গিয়ে ছোঁকরার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পেল্লায় চড় তুলে ফেলেছিল। এমন সময় উদভ্রান্তের মতো ছুটে এল কালী কাপালিক।

“ওরে, মারিসনে! মারিসনে! মহাপাতক হয়ে যাবে! এ যে মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর?”

সভা কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ মেরে গেল।

পটল গাঙ্গুলি বললেন, "তার মানে?"

কালী কাপালিকের চুলদাড়ি সব উড়ছে, সর্বাঙ্গে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার দাগ। রক্তাম্বরও ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। মণ্ডপে উঠে ছোঁকরাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাতের শুলটা আপসে নিয়ে বলে, "রায়দিঘির রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নাম শোননি নাকি? এ-হল তার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। আকাশে এখনও চন্দ্র-সূর্য ওঠে, কালীর সব কথাই মিছে বলে ধোরো না। এ কথাটা বিশ্বাস করো। এ চোর-ছ্যাচড় নয়।"

সবাই একটু হকচকিয়ে গেছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা গুঞ্জনও উঠল নতুন করে।

হলধর থাপ্পড়টা নামিয়ে নিয়ে বলল, "তুই তো গঙ্গাজলের মতো মিথ্যে কথা বলিস! এর সঙ্গে তোর সাঁট আছে।"

পটল গাঙ্গুলি বললেন, "ওরে কালী, এ যে মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর তার প্রমাণ কী? প্রমাণ নইলে আমার হাতে তোর লাঞ্ছনা আছে।"

"প্রমাণ আছে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের ছেলে হল বিজয়প্রতাপ, তস্য পুত্র রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র নরেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র তপেন্দ্রপ্রতাপ, সত্য পুত্র রবীন্দ্রপ্রতাপ এবং তস্য পুত্র এই ইন্দ্রজিপ্রতাপ। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। স্বয়ং চন্দ্রকুমারের মুখ থেকে শোনা।"

কে যেন বলে ওঠে, "ব্যাটা গুল ঝাড়ছে।"

ঠিক এই সময়ে ছেলে অলঙ্কারকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠে এল হরিপদ। হাতজোড় করে বলল, "মাতব্বররা অপরাধ নেবেন না। কালী কাপালিক মিছে কথা বলছে না। যতদূর জানি, ইনি সত্যিই মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর। কপালের ফেরে পড়ে নিদোষ লোক আমাদের হাতে অপমান হচ্ছেন।"

হরিপদ গরিব হলেও সৎ মানুষ বলে সবাই জানে। পটল গাঙ্গুলি বললেন, “তুমি যখন বলছ তখন একটা কিন্তু থাকছে। রায়দিঘির রাজা মানে শিমুলগড়ও তাঁর রাজত্বের মধ্যে ছিল। আমরা–মানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রায়দিঘিরই প্রজা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ইনি তো মানী লোক। কিন্তু হাওয়াই কথায় তো হবে না, নীরেট প্রমাণ চাই যে। ওরে ও হলধর, ওর বাঁধনটা খুলে দে। বসতে দে। একটু জলটলও দিয়ে নে আগে।”

তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে ইন্দ্রজিৎকে বসানো হল। ছুটে গিয়ে অলঙ্কার একভাঁড় জল নিয়ে এল। সেটা খেয়ে ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে জিরিয়ে নিল। তারপর চোখ খুলে বলল, “প্রমাণ আছে। দলিলের কপি আমি সঙ্গেই এনেছি। রায়দিঘির রাজবাড়ির চত্বরে আমার তাঁবুতে রয়েছে। কেউ যদি গিয়ে নিয়ে আসতে পারে তো এখনই দেখাতে পারি।”

গৌরগোবিন্দ খাড়া হয়ে বসে বললেন, “পারবে না মানে! আলবাত পারবে। সাইকেলে চলে গেলে কতটুকু আর রাস্তা! তুমি বাপু একটু জিরোও, আমরা তোক পাঠাচ্ছি।”

সবাই সায় দিয়ে উঠল। কয়েকজন ছেলেছোঁকরা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা তাঁবু সহ সব জিনিস এনে ফেলল তারা।

গৌরগোবিন্দ তাঁর বাড়ি থেকে একটু গরম দুধ আনিয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে। ইন্দ্রজিৎ সেটা শেষ করে তার হ্যাঁভারস্যাক থেকে কাগজপত্র বের করে বলল, “এই হচ্ছে আমাদের দলিল। বাবার কাছেই ছিল, আমি ফোটোকপি করে এনেছি। আর এই দেখুন, আমার পাশপোর্ট, আমি যথার্থই রবীন্দ্রপ্রতাপের ছেলে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ, মহেন্দ্রপ্রতাপের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।”

পটল গাঙ্গুলি শশব্যস্তে বললেন, “তুমি কি বিলেতে থাকো নাকি বাবা?”

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিলেত শুনে সকলেই একটু ভড়কে কেমনধারা হয়ে গেল। পটল গাঙ্গুলি মাথা নেড়ে বললেন, "তা হলে ঠিকই আছে। আমিও শুনেছিলাম, রাজবাড়ির উত্তরপুরুষেরা বিলেতে থাকে।"

গৌরগোবিন্দ বললেন, "আমি তো এর দাদু তপেন্দ্রপ্রতাপ আর তস্য পিতা নরেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে রীতিমত ওঠাবসা করেছি। রবীন্দ্রপ্রতাপকেও এইটুকু দেখেছি ওদের কলকাতার বাড়িতে। এ তো দেখছি সেই মুখ, সেই চোখ। তবে স্বাস্থ্যটা হয়নি তেমন। তপেন্দ্রপ্রতাপ তো ইয়া জোয়ান ছিল।"

চারদিকে একটা সমীহের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে একটু অনুশোচনাও। হলধর একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, "কাজটা বড় ভুল হয়ে গেছে রাজাবাবু। মাফ করে দেবেন।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, "আমাকে রাজাগজা বলবেন না। আমি সাধারণ মানুষ, খেটে খাই। আমি যে রাজবংশের ছেলে তাও আমার জানা ছিল না। চন্দ্রকুমারের লেখা একটা পুরনো পুঁথি থেকে লুকনো মোহরের সন্ধান জেনে এদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তখনই আমার বাবা আমাকে জানালেন, রায়দিঘির রাজবাড়ির আসল উত্তরাধিকারী আমরাই। ভেবেছিলাম মোহর উদ্ধার করে সেগুলো বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাব। বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু টাকার চেয়েও মোহরগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। বিক্রি না করলেও অবশ্য মোহরগুলো থেকে আমার অনেক আয় হত। ভেবেছিলাম, আমার পূর্বপুরুষ মহেন্দ্রপ্রতাপ তো প্রজাদের বঞ্চিত করেই মোহর জমিয়েছিলেন, সুতরাং আমি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কিছু করব। অলঙ্কারের মতো বাচ্চা ছেলেরা এখানে ভাল খেতে-পরতে পায় না, গাঁয়ে হাসপাতাল নেই, খাওয়ার জলের ব্যবস্থা ভাল নয়। এগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু মোহরগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল।"

সবার আগে নটবর ঘোষ লাফিয়ে উঠল, "গেল মানে! আমরা আছি কী করতে?"

সকলেই হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

ঠিক এই সময়ে বাইরের জমাট অন্ধকার থেকে হঠাৎ যমদূতের মতো দুই মূর্তি চণ্ডীমণ্ডপে উঠে এল। হাতে বিরাট-বিরাট দুটো ছোরা হ্যারিকেনের আলোতেও ঝলসে উঠল।

কে যেন আতঙ্কের গলায় বলে উঠল, "ওরে বাবা! এ যে কালু আর পীতাম্বর!"

সঙ্গে-সঙ্গে গোটা চণ্ডীমণ্ডপে একটা হুলুস্থুল হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পালানোর জন্য এমন ঠেলাঠেলি যে, এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে। যারা নেমে পড়তে পারল তারা তাড়াতাড়িতে ভুল জুতো পরে এবং কেউ-কেউ জুতো ফেলেই চোঁ-চাঁ পালাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মণ্ডপ একেবারে ফাঁকা। শুধু পটল গাঙ্গুলি, গৌরগোবিন্দ, হরিপদ, অলঙ্কার আর ইন্দ্রজিৎ। তারা কেউ নড়েনি।

পীতাম্বর চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে! এই ছোঁকরাটা!"

কালু বলে, "দে ভুকিয়ে। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

পীতাম্বর ছোরাটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "এই যে দিই। জয় মা..."

কিন্তু মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গৌরগোবিন্দর পাকা বাঁশের ভারী লাঠি পটাং করে তার মাথায় পড়ল।

"বাপ রে!" বলে বসে পড়ল পীতাম্বর।

কালু অবাক হয়ে বলে, "এরও লেঠেল আছে দেখছি। সকলেরই যদি লেঠেল থাকে তা হলে কাজকর্ম চলে কিসে?"

কিন্তু তাকেও আর কথা বলতে হল না। গৌরগোবিন্দর লাঠি পটাং করে তার কাঁধে পড়ল।

"উরেব্বাস!" বলে বসে পড়ে কাল।

তারপর কিছুক্ষণ শুধু পটাং-পটাং লাঠির শব্দ হল। কালু আর পীতাম্বর ফের অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। একেবারে চিতপটাং।

গৌরগোবিন্দ দুঃখ করে বললেন, "সন্ধেবেলা একবার ভূত ঝেড়ে দিয়েছি। তাতেও দেখছি আক্কেল হয়নি! ওরে তোরা সব কোথায় পালালি? আয় আয়, ভয় নেই। এ দুটি বাঘ নয় রে, শেয়াল।"

কালী কাপালিকের চারদিকে নজর। একটু তফাত হয়েছিল। গুণ্ডা দুটো ঘায়েল হয়েছে দেখে সবার আগে এসে সে পীতাম্বরকে একটু যেন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আহা, বড় হ্যাপা গেছে এদের গো। আর লাঞ্ছনাটাও দেখতে হয়.." বলতে বলতেই নজরটা চলে গেল ট্যাঁকে। জামা উঠে গিয়ে ট্র্যাকের ফোলাটা দেখা যাচ্ছে। পীতাম্বরের টাক থেকে বারো হাজার টাকার বান্ডিলটা বের করে সে চোখের পলকে রক্তাম্বরের ভেতরে চালান দিয়ে দিল, "মায়ের মন্দিরটা এবার তা হলে হচ্ছেই! জয় মা..."

.

এদিকে গগনের ঘরে গগনের অবস্থা খুবই কাহিল। ইতিমধ্যে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, বল্লমের খোঁচায় তার পেট একটু ছ্যাদা হয়েছে। চোখে ঝাঁপসা দেখছে গগন। দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই বলে সে সারা ঘরে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে, "খবর্দার! খবর্দার! একদম জানে মেরে দেব কিন্তু! ভগবানের দেওয়া মোহর। যে ছোঁবে তার অসুখ হবে। খবর্দার..."

খাঁড়াটা হামা দেওয়ার সময়েও হাতছাড়া করেনি গগন, ঘষটে ঘষটে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কে যেন আলতো হাতে খাঁড়াটা তুলে নিয়ে দেওয়ালের গজালে ঝুলিয়ে রাখল। গগন বলল, "ক্কে?"

তারপরই গগন স্থির হয়ে গেল। সে শুনতে পেল, তার ঘরে দুটো লোক কথা কইছে।

একজন বলল, "বৎস চন্দ্রকুমার, একটা রহস্য ভেদ করে দেবে? আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি বায়ুভূত হয়েও দিব্যি পার্থিব জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে পারছ। এইমাত্র ভারী খঙ্গখানা তুলে ফেললে। কিন্তু আমার হাত-পাগুলো এমনই ধোঁয়াটে যে কই আমি তো তোমার মতো পারছি না!"

"আজ্ঞে মহারাজ, দেড়শো বছর মোহরে ডুবে থেকে আপনার কোনও ব্যায়ামই হয়নি যে। তাই এখনও ধোঁয়াটে মেরে আছেন। আর আমি বাইরের খোলামেলা আলো-হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই বলে আমার কিছু পোষ্টাই হয়েছে। তা ছাড়া নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলনে আমি বায়বীয় শরীরকে যথেষ্ট ঘনীভূত করে তুলতে পারি। সেটা না পারলে আপনার ছ' নম্বর উত্তরপুরুষকে বাঁচাতে পারতাম না। তাকে ঘাড়ে করে মাইলটাক বইতে হয়েছে কাল রাতে। তারও আগে থেকে তাকে নানারকম সাহায্য করে আসছি। এমনকী বিলেত অবধি ধাওয়া করে আমার পুঁথিটা উদ্ধার করে তার হাতের নাগালে আমিই এগিয়ে দিয়েছিলাম। আমাকে কিন্তু নিমকহারাম বলতে পারবেন না মহারাজ।"

"আরে না, না। তোমার কাজকর্ম যতই দেখছি ততই সন্তুষ্ট হচ্ছি। তা এ-লোকটাকে কি তুমি মেরে ফেলবে?"

"আজ্ঞে না মহারাজ, পৃথিবীতে আর-একটা যখ বাড়াতে চাই না। আপনার ষষ্ঠ উত্তরপুরুষের ওপর অন্যায় হামলা করায় এশাস্তি ওর পাওনাই ছিল।"

"ও, ভাল কথা চন্দ্রকুমার, আমার সেই উত্তরপুরুষটি কোথায়? সে নিরাপদে আছে তো!"

"ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। ছোঁকরা একটু বিপদের মধ্যেই আছে।

তবে জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিপদআপদ ঘটা ভাল। তাতে মানুষ শক্তপোক্ত হয়, আত্মরক্ষা করতে শেখে, বুদ্ধি আর কৌশল বৃদ্ধি পায়, বাস্তববোধ জেগে ওঠে।"

চোখের রক্ত মুছে গগন ভাল করে চেয়ে হাঁ করে রইল। তার সামনে ঘরের মধ্যে দুটো বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে। দুজনেরই পরনে ঝলমলে রাজাগজার পোশাক। গগন হুঙ্কার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে চিচি শব্দ বেরোল, "ওরে চোর, তোরা এ-ঘরে ঢুকলি কী করে?"

তার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না। গগন দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে খাঁড়াখানা দেওয়াল থেকে টেনে হঠাৎ আচমকা ঘ্যাচাং করে এককোপে কেটে ফেলল একজনকে।

"আহা হা, চন্দ্রকুমার! তোমাকে যে একেবারে দু-আধখানা করে কেটে ফেলল! সর্বনাশ!"

চন্দ্রকুমার একটু হেসে বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ঘনীভূত অবস্থায় ছিলাম কিনা! তাই কেটে ফেলতে পেরেছে। তবে জুড়ে নিতে দেরি হবে না।"

চন্দ্রকুমারের শরীরের নীচের অংশটি আলাদা হয়ে সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। চন্দ্রকুমার বললেন, "আমার ওই অংশটি কিছু দুষ্ট প্রকৃতির..." বলতে বলতে তিনি গিয়ে ওই অংশটি আবার প্যান্ট পরার মতো সহজেই জুড়ে নিলেন শরীরে।

গগন সাঁপুই খাঁড়াসমেত ফের মেঝের ওপর পড়ে গেছে। বিড়বিড় করে সে বহুঁকাল আগে শোনা কর্ণার্জুন' নাটকের একখানা সংলাপ বলে যাচ্ছে, "চলে গেলি একবিঘাতিনী, মরণের নামমাত্র করিয়া প্রচার, কিরিটীর কিরিট ভূঁইয়া?"

"ওহে গগন!"

গগন দুখানা হাত জোড় করে বলে, "যে আজ্ঞে।"

"কেমন বুঝছ?"

"আজ্ঞে, আপনাদের সঙ্গে এঁটে উঠব না।"

"মোহরের থলিটা যে এবার বের করতে হবে ভায়া।"

গগন খুব অবাক গলায় বলে, "মোহর! হুজুর, মোহরটা আবার কোথায় দেখলেন? কু-লোকে কুকথা রটায়।"

"তোমার চেয়ে কু-লোক আর কে আছে বাপু? একটু আগে তুমি মহারাজের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষকে খুন করতে দুটো খুনিকে পাঠিয়েছ। তুমি অন্যায়ভাবে পরস্পাপহরণ করেছ।"

"আজ্ঞে না হুজুর, আমি পরের অপকার করিনি। আর সেই চোর যে মহারাজের কেউ হন, তাও জানতুম না কিনা!"

"কিন্তু মোহর!"

গগন কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "আজ্ঞে, ভগবান দিয়েছেন। তাই..."

"এই যে মহারাজকে দেখছ, ইনি মোহরের খপ্পরে পড়ে দেড়শো বছর পাতাল-ঘরে মাটিচাপা ছিলেন।"

গগন ডুকরে উঠল, "ওরে বাবা, আমি মোটে বন্ধ জায়গা সইতে পারি না। ছেলেবেলায় একবার পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে বেজায় ভয়।"

"তা হলে উঠে পড়ো গগন! মোহর বের করে ফ্যালো।"

গগন হাতজোড় করে বলে, "বড্ড লোকসান হয়ে যাবে যে!"

"মোহর তো আলমারি খুলে আমিই বের করতে পারি। কিন্তু তাতে তো তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না গগন। ওঠো। আর দেরি নয়। তারা আসছে।"

"হুজুর, বড্ড গরিব হয়ে যাব যে। কোটি-কোটি টাকা থেকে একেবারে পপাতধরণীতলে! দু-চারখানা যদি রাখতে দেন।"

"দু' শো এগারোখানা মোহর গুনে দিতে হবে। ওঠো।"

"আজ্ঞে, মাজায় বড় ব্যথা। দাঁড়াতে পারছি না।"

"তা হলে হামাগুড়ি দাও। তুমি দুর্বিনীত, হামাগুড়ি দিলে কিছু বিনয় প্রকাশ পাবে।

.

গগন মোহরের থলি নিয়ে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরোল, তখন উঠোনে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। অনেক মশাল জ্বলছে। ভিড়ের মাঝখানে রোগা ছেলেটা দাঁড়িয়ে।

গগন সিঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল। মোহরের থলিটা উঁচুতে তুলে ধরে বলল, "বড্ড গরিব হয়ে গেলাম, আত্তে।"

লাঠি হাতে একটা লোক দু'পা এগিয়ে এসে বলল, "গগনবাবু, দুটো বা হাতওলা লোক এই এতক্ষণে খুঁজে পেলাম। কথাটা সারাদিন মাথায় চক্কর দিচ্ছিল। আপনারই মশাই, দুটোই বাঁ হাত। ডান হাতেও তো আপনি অশুদ্ধি কাজই করেন। কাজেই ওটাও বাঁ হাতই।" বলে লক্ষ্মণ পাইক চারদিকে একবার চাইল, "আর ন দিয়ে নামের আদ্যক্ষর..."

নটবর ঘোষ টপ করে মাথাটা নামিয়ে ফেলায় লক্ষ্মণ বলে উঠল, "আপনিও খারাপ লোক নটবরবাবু। তবে এ-আদ্যক্ষর আপনার নামে নয়। নামটা আমারই। আমার পিতৃদত্ত নাম নরহরি। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

গাঁ-সুদ্ধু লোক হেসে উঠল।